বিবর্ণ তুষার

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

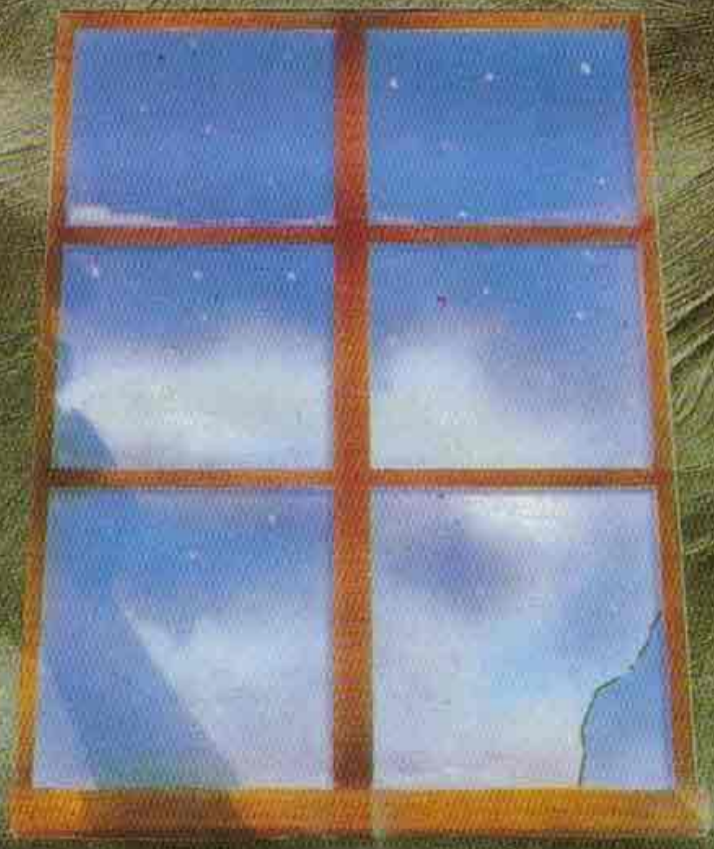

উৎসর্গ

আলী হায়দার খান
মোহম্মদ শহীদুল্লাহ ও
আব্দুর রাজ্জাক স্বপন
প্রীতিভাজনেষু

১

টেবিলের তলা থেকে খুব ধীরে ধীরে একটা তেলাপোকা বের হয়ে এল। মাঝরাতে পানি খেতে ওঠার সময় রান্নাঘরে মাঝে মাঝে যে-অর্ধস্বচ্ছ ছোট তেলাপোকা দ্রুত পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে, এটা মোটেও সেরকম নয়। এটা মোটা এবং বড়। গায়ের রং গাঢ় বাদামী, প্রায় কালচের কাছাকাছি। লম্বা শুঁড় এবং বড় বড় চোখ। একেবারে দেশের তেলাপোকা। দেশে স্টোর-রুমে চালের টিনের পিছনে যে তেলাপোকা লুকিয়ে থাকে এবং বাদলা দিনে হঠাৎ করে একটি দু'টি ক্ষেপে গিয়ে অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসে বসার ঘরে উড়তে শুরু করে, মেয়েমহলে আতঙ্ক জাগিয়ে দেয়—এটি সেই তেলাপোকা। তারিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, লস এঞ্জেলসে এই তেলাপোকা কোথা থেকে এল? যদি এসেই থাকে, কারো রান্নাঘরের কোণায় না গিয়ে এই ল্যাবরেটরিতে কেন?

তারিক হাতের প্রোবটি টেবিলে রেখে উবু হয়ে তেলাপোকাটির দিকে তাকাল। এটি দেশের তেলাপোকার মতো বড় হতে পারে, কিন্তু সেরকম চালাক-চতুর মনে হচ্ছে না। ভাবভঙ্গি খানিকটা নির্জীবের মতো। টেবিলের তলা থেকে বের হতে গিয়ে মনে হয় সব শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে, খানিকটা দম নিয়ে আবার এগিয়ে যাবে। তারিক পা দিয়ে একটু শব্দ করল, তেলাপোকাটি অলসভাবে একটু শুঁড় নেড়ে পালাবার চেষ্টা করল বলে মনে হল, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। দেশের তেলাপোকা হলে এতক্ষণে হাওয়া হয়ে যেত।

তারিক খানিকক্ষণ তেলাপোকাটি লক্ষ করে সাবধানে শুঁড় ধরে ঝুলিয়ে তোলার চেষ্টা করল। সাপ, জোঁক কিংবা যে-কোনো লম্বা এবং পিচ্ছিল জিনিস দেখলে তার কেমন জানি গা ঘুলিয়ে আসে, কিন্তু পোকামাকড়ে তার বেশি ঘেন্না নেই।

তেলাপোকাটি এত সহজে তাকে তার শুঁড় ধরে টেনে তুলতে দেবে, তারিক সেটা মোটেও আশা করে নি। শুঁড়টা সরিয়ে নেবার একটা দুর্বল চেষ্টা করে কেমন জানি হাল ছেড়ে দিল। তারিক তেলাপোকাটি চোখের কাছে এনে দেখে, কে জানে হয়তো এটি বৃদ্ধ তেলাপোকা কিংবা কে জানে হয়তো এটি অসুস্থ। কে জানে হয়তো এটা শোকাহত, কীটপতঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চয়ই নিচুস্তরের, কিন্তু মানুষ আর কতটুকু জানে?

তারিক তেলাপোকাটি মেঝেতে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন দরজা খুলে শ্যারন এসে ঢুকল। শ্যারনের বয়স বাইশ থেকে পঁচিশের ভিতর। অঙ্কশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি. করতে গিয়ে মাঝখানে ছেড়েছুড়ে তারিকদের দলে এসে ভিড়েছে। শ্যারন অসম্ভব সুন্দরী মেয়ে এবং শুধুমাত্র সে-কারণে তাকে নিতে প্রফেসর নিল ইয়ং কোনো আপত্তি

করেন নি, এ ধরনের একটা কথা শোনা যায়। তারিকের ধারণা, কথাটিতে খানিকটা সত্যতা রয়েছে। ল্যাবরেটরির কাজে শ্যারনের একেবারে কোনো রকম ধারণা নেই, তারিক তাকে কাজকর্ম শেখায়। বেশ শখ করেই শেখায়, এত সুন্দরী মেয়ে— প্রত্যেকবার চোখ ফেরাতেই তার বুকে রক্ত ছলাৎ করে ওঠে।

শ্যারনকে দেখে তারিক তেলাপোকাটি উঁচু করে ধরল। বলল, দেখ কী পেয়েছি!

কী? শ্যারন কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসে।

এই দেখ। বেশি নড়াচড়া করছে না। মনে হয় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

শ্যারন কাছে এগিয়ে আসে। দেশের একটি মেয়ে হলে এতক্ষণে চেঁচামেচি হৈচৈ করে একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলত। সবার যে সবকিছু ভালো লাগতে হবে সেরকম কোনো আইন নেই, কিন্তু সেটা নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করতে হবে সেরকমও তো কোনো কথা নেই। শ্যারন মুগ্ধ চোখে হাত বাড়িয়ে বলল, কী এটা?

তেলাপোকা।

এর পর যে-ব্যাপারটি ঘটল, তারিক তার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। শ্যারন গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার করে এক লাফে পিছিয়ে গেল। একটা কার্টে ধাক্কা খেয়ে সে ভয়ংকর আরেকটা চিৎকার করে পাশের টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে গেল। টেবিলের উপর থেকে কিছু জিনিসপত্র গড়িয়ে পড়ল নিচে, জাইলীনের একটা বোতল ভেঙে ঝাঁঝালো গন্ধে পুরো ল্যাবরেটরি ভরে গেল সাথে সাথে। শ্যারন দুই হাত সামনে তুলে অদৃশ্য কিছু একটা ঠেলে দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করতে থাকে। দেখে মনে হয় এখনই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

তারিক এত হকচকিয়ে গেল যে বলার নয়। যখন পাশের ল্যাবরেটরি থেকে জন এবং জিম, সামনের অফিস থেকে প্রফেসর বিল ইয়ং, সেক্রেটারি সারা, ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড এবং চিঠি দিতে আসা কালো মেয়েটি প্রায় ছুটতে ছুটতে ল্যাবরেটরিতে হাজির হয়েছে, তখনো তারিক তেলাপোকাটি শুঁড় ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে।

কী হয়েছে? প্রফেসর বিল ভয়-পাওয়া গলায় প্রশ্নটি করেই বুঝতে পারলেন, যা-ই ঘটে থাকুক, সেটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। মুখ থেকে আতঙ্কের ছায়াটি সরে গিয়ে কৌতূহল ফুটে উঠল।

তারিক অপ্রস্তুতের মতো তেলাপোকাটি দেখিয়ে বলল, শ্যারন যে এত ভয় পাবে বুঝতে পারি নি!

জন শ্যারনের মতোই আরেকজন ছাত্র। কথা বলার ধরন খুব খারাপ। এবারে হোঃ হোঃ করে শব্দ করে হেসে বলল, তাই বল! আমরা ভাবলাম, তুমি শ্যারনকে রেপ করার চেষ্টা করছ!

প্রফেসর বিল কথাটা না শোনার ভান করে শ্যারনের দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন, বললেন, এত ভয় পাওয়ার কী আছে শ্যারন? একটা পোকা ছাড়া তো আর কিছু না।

শ্যারন প্রফেসর বিলের হাত ধরে সাবধানে টেবিল থেকে নেমে এল, তখনো সে

কাঁপছে। তারিক বলল, আমি খুব দুঃখিত শ্যারন। তুমি এত ভয় পাবে জানলে—

ফেলে দাও প্লীজ। ফেলে দাও

তারিক অপ্রস্তুতের মতো তেলাপোকাটি ছেড়ে দিল, সেটি মেঝেতে উল্টো হয়ে পড়ে ইতস্তত পা নাড়তে থাকে। সোজা হয়ে পালিয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই করে না। দেশের তেলাপোকার তুলনায় এটি দুগ্ধপোষ্য শিশু।

শ্যারন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, মেরে ফেল—মেরে ফেল প্লীজ!

কমবয়সী সুন্দরী একটা মেয়ের এরকম কাতর একটা আহ্বান কেউ ফেলে দিতে পারে না। সব কয়জন পুরুষমানুষ এবারে একসাথে এগিয়ে আসে। প্রফেসর বিল বললেন, ফ্লাস্কে করে একটু লিকুইড নাইট্রোজেন এনে ঢেলে দাও। একেবারে জমে যাবে।

ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড বলল, উঁহু। এই প্রজাতি খুব শক্ত। উপরে ঢাললে হবে না। ফ্লাস্কের ভিতরে এটাকে ছেড়ে দিতে হবে। ডাইনোসরের আমল থেকে আছে এরা।

জিম তারিকের মতো একজন রিসার্চ ফেলো, বলল, একটা কেমিক্যাল আছে, যেটা তেলাপোকার নার্ভাস সিস্টেমকে অ্যাটাক করে, নামটা ভুলে গেছি। কেমিস্ট্রি ল্যাবে দেখেছিলাম, গিয়ে নিয়ে আসব?

জন, যার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি চালচলন সবকিছুতে বেপরোয়া উদ্ধত প্রায়, অশোভন একটা ভাব, এগিয়ে এসে বলল, তেলাপোকা কীভাবে মারতে হয় এখনো জান না, এই দেখ—

সে তার পা দিয়ে সশব্দে তেলাপোকাটি মেরে একেবারে মেঝেতে পিষে ফেলল।

প্রফেসর বিল প্রায় একটা আহত দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে একটা কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। শ্যারনের মুখ দেখে মনে হল সে একটা বাচ্চা প্রসব করার চেষ্টা করছে, অন্য সবাই কমবেশি একটা আর্তচিৎকারের মতো শব্দ করল।

জন তার জুতোর তলা থেকে লেপটে থাকা তেলাপোকার দেহাবশেষ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করার সময় একে একে সবাই ঘর থেকে বিদায় নিল, দৃশ্যটি অস্বস্তিকর। তারিক জনের জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, তুমি ইচ্ছে করে এরকম কর, তাই না?

কী রকম করি?

এই যে তেলাপোকাটাকে এইভাবে পিষে ফেললে?

তাহলে কি আচার বানিয়ে রাখব?

না, আচার বানাতে হবে না। কিন্তু এত বড় একটা তেলাপোকা সবার সামনে চ্যাটকা বানিয়ে ফেললে, দেখে ঘেন্না লাগে না? তোমারও নিশ্চয়ই লাগে, কিন্তু অন্যদের যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে তুমি এটা কর। ঠিক না?

জন দাঁত বের করে হাসল। বলল, ঠিক। ন্যাকামো দেখলে আমার একেবারে গা জ্বলে যায়। কথাবার্তার ধরন দেখ সবার, এক তেলাপোকা নিয়ে কত রকম গবেষণা!

তথ্যাগারে যখন ইয়ে করে তখনো কি এরকম গবেষণা করে? এদিক দিয়ে করব, না ওদিক দিয়ে—

জন কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে বিশ্রীভাবে হাসতে থাকে।

ছেলেটার ভিতরে ভালো লাগার কিছু নেই। রুক্ষ চেহারা, উঁচু কপাল, হলুদ চুল, ধূসর চোখ, উঁচু চোয়াল, ময়লা দাঁত। অগোছালো জামাকাপড়, কথাবার্তা চালচলনে একটা উদ্ধত অশোভন ভঙ্গি। জগৎ-সংসারের সবকিছুতেই তার কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। তবুও কোনো একটা কারণে তারিক ছেলেটাকে পছন্দ করে। কারণটা কী কে জানে? সভ্যসমাজে থাকার জন্যে সবাইকে একটা সূক্ষ্ম অভিনয় করে যেতে হয়। পদে পদে ভালো লাগার, খুশি হওয়ার, কৃতজ্ঞ হওয়ার একটা ভান করে যেতে হয়। জন কখনোই করে না, সে কারণেই কি?

জুতোর তলা থেকে তেলাপোকার শেষ অংশটি পরিষ্কার করে জন বলল, টাড়েক—

শব্দটি তারিক। টাড়েক না।

তাই তো বললাম, টাড়েক।

তোমার কাছে তারিক আর টাড়েক একরকম শোনায়?

একরকম নয়?

তারিক হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে বল, কী বলবে।

আমি একটা পেপার লিখেছি, তুমি ইংরেজিটা দেখে দেবে?

তারিক উত্তর দেবার আগেই টেলিফোন বাজল, বেশ অনেক কয়জনের টেলিফোন এই ল্যাবরেটরির সাথে জুড়ে দেয়া আছে। তারিক মাথা ঘুরিয়ে দেখল, সবচেয়ে উপরের বাতিটি জ্বলছে, যার অর্থ টেলিফোনটা তার। সে জনকে বলল, এক সেকেন্ড দাঁড়াও।

টেলিফোন করেছেন আমজাদ সাহেব, এখানকার বয়স্ক মানুষজনের একজন। দেশ হলে তারিক চাচা বলে ডাকত, এখানে ভাই বলে ডাকে। তারিক বলল, আমজাদ ভাই, কী খবর?

আমার আর কী খবর হবে! তোমরা কি আর কখনো খোঁজখবর নেবে আমার—আমজাদ সাহেব তার কাঁদুনি গাইতে শুরু করলেন। ভদ্রলোককে সুযোগ দেয়া হলেই দীর্ঘসময় ধরে নানা রকম কাঁদুনি গাইতে থাকেন। তাঁকে কেউ দেখতে পারে না, কেউ তাঁকে পছন্দ করে না, সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে—এই ধরনের কথা বলায় তিনি বিমলানন্দ পান। তারিক ধৈর্য ধরে বসে রইল, শুধু কাঁদুনি গাইবার জন্যে তিনি ফোন করেন নি, নিশ্চয়ই অন্য কারণও আছে।

কারণটা একটু পরেই বললেন, আজ রাতে তারিক যদি ব্যস্ত না থাকে, সে তার বাসায় খেতে যেতে পারবে কি না।

তারিক খুব যত্ন নিয়ে এই ধরনের চরিত্রদের এড়িয়ে চলে। বিদেশে বাঙালিদের

মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগের সব সময় দেশের জন্যে মন কেমন কেমন করতে থাকে, মোটামুটি নূতন প্রেমের মতো দেশের জন্যে একটা ভালবাসার জন্ম হয়। অন্য ভাগের দেশের জন্যে একটা আশ্চর্যরকম হৃদয়হীন বিতৃষ্ণার জন্ম হয়। আমজাদ সাহেব দ্বিতীয় দলের লোক। তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি নিজের কাঁদুনি শেষ করেই দেশ এবং দেশের মানুষকে গালিগালাজ শুরু করেন। দেশ সম্পর্কে ভয়ংকর সব গল্প সব সময়েই তাঁর কাছে মজুত থাকে, তাঁর সাথে দেখা হলেই তিনি সেইসব গল্প একটার পর আরেকটা আশ্চর্য উৎসাহ নিয়ে ছাড়তে থাকেন। আমজাদ সাহেবের রান্নায় হাত বাধা না হলে তারিক কখনো যায় না। আজকেও সে খুব সহজেই "ব্যস্ত আছি" বলে না করে দিতে পারত। এত অল্প সময়ের নোটিশে যেতে না পারা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু তারিক না করল না, খাবারের আমন্ত্রণটুকু গ্রহণ করে ফেলল। আমজাদ সাহেবের স্ত্রী অত্যন্ত ভালো রান্না করেন। তারিক দীর্ঘদিন থেকে ঠিম সেদ্ধ খেয়ে মোটামুটি বুভুক্ষু হয়ে আছে, সেটা একটা কারণ। বাসায় আরো কিছু লোকজন আসবে, তাদের সাথে খাঁটি বাঙালি কায়দায় আড্ডা জমতে পারে, সেটা দ্বিতীয় কারণ। দেশ থেকে আমজাদ সাহেবের একজন সুন্দরী শ্যালিকা এসেছে, সেটা তৃতীয় এবং প্রধান কারণ। মেয়েদের প্রতি তারিকের খানিকটা দুর্বলতা আছে। তার বয়স পঁচিশ, এর মাঝে কখনোই তার কোনো মেয়ের সাথে অন্তরঙ্গতা হয় নি। চমৎকার একটি মেয়ের সাথে ভালবাসার কথা বলার জন্যে মাঝে মাঝেই তার বুক হা-হা করে। ব্যাপারটি কীভাবে ঘটতে পারে তার জানা নেই, সজ্ঞানে কখনো তার চেষ্টা করে নি, কিন্তু সব সময়েই মেয়েদের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করেছে।

টেলিফোন রেখে ফিরে আসতেই জন বলল, তোমরা অনেক তাড়াতাড়ি কথা বল।

তুমি কেমন করে জান?

শুনলাম।

যে ভাষা বোঝ না সেটা শুনে তুমি কী বুঝবে?

তা ঠিক। তুমি তো ইংরেজিটাও ভালো জান, উচ্চারণটা হাস্যকর, কিন্তু লেখ ভালো। আমার পেপারটা দেখে দেবে প্লিজ টেকনিক্যাল জিনিসটা লাগবে না, শুধু ইংরেজিটা।

তারিক উত্তর দেবার আগেই শ্যারন এসে ঢুকল। মুখে-চোখে ভয়ের ভাবটা আর নেই, বরং একটু অপ্রস্তুত লজ্জার ভাব। তাকে দেখেই জন দুলে দুলে হাসতে শুরু করে। শ্যারন জিজ্ঞেস করল, তুমি এরকম বাজেভাবে হাসছ কেন?

সাহসী মানুষ দেখলে আমার এত আনন্দ হয় যে, হাসি থামাতে পারি না।

যন্ত্রণা করো না জন, তোমার চেহারা দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। শ্যারন তারিকের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি খুব দুঃখিত ওরকম একটা নাটক করার জন্যে। তেলাপোকা আমার ভীষণ খারাপ লাগে। ছোট তেলাপোকা দেখলেই আমার গা কেমন করতে থাকে, আর এত বড় তেলাপোকার কথা তো ছেড়েই দাও।

জন বাধা দিয়ে বলল, আসলে কী হয়েছে জান?

www.banglainternet.com

কী?

তোমার কোনো পূর্বপুরুষকে অতিকায় হেলাপোকা কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলেছিল। সেই ঘটনা তোমার রক্তের মাঝে, তোমার জিনসের মাঝে রয়ে গেছে। বংশ পরম্পরায়—

চুপ করো না জন। তুমি বড় বাজে কথা বল!

জন উঠে দাঁড়াল, বলল, আমি গেলাম টাডেক। তুমি পেপারটার ইংরেজিটা দেখে দেবে তো?

দেব।

শ্যারন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কিসের ইংরেজি?

আমার পেপারটার।

তোমার জন্ম এখানে, বড় হয়েছ এখানে, আর তোমার পেপারের ইংরেজি দেখে দেবে তারিক? একজন বিদেশি মানুষ? যার মাতৃভাষা হিন্দি?

তারিক বাধা দিয়ে বলল, হিন্দি নয়, বাংলা।

যার মাতৃভাষা বাংলা?

জন মুখে একটা হাসি এনে বলল, তোমার লজ্জা করে না তারিকের কাছে পদার্থবিজ্ঞান শিখতে? যার জন্ম হয়েছে বাংলাদেশে—বড় হয়েছে বাংলাদেশে? যে-দেশের মানুষ ছয় মাস খায়, বাকি ছয় মাস খাইখাই করে?

জন শব্দ করে হাসতে শুরু করে। তারিক স্থির দৃষ্টিতে জনের চোখের দিকে তাকাল। সে-চোখে কোনো বিদ্বেষ নেই, কোনো ঘৃণা নেই, অবজ্ঞা নেই, কোনো বিদ্বেষ নেই, শুধু কৌতুক।

শুধু কৌতুক।

২

ঠিকানা মিলিয়ে শ্যারন তার গাড়ি থামাল। তারিক বলল, অনেক ধন্যবাদ শ্যারন। তুমি আমার অনেক ঝামেলা বাঁচিয়ে দিলে।

কোনো সমস্যা নেই। তোমাকে বাসায় সত্যি কেউ পৌঁছে দেবে তো?

হ্যাঁ। সেটা নিয়ে চিন্তা করো না।

সঙ্গেটা উপভোগ কর।

করব। কাল দেখা হবে।

শ্যারন হাত নেড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল। গাড়িটি কী সুন্দর! শুধু যে সুন্দর তাই নয়, রেখেছেও কত সুন্দর করে! তারিকের জন্যে গাড়ি হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার একটা মাধ্যম। শ্যারন এবং সম্ভবত সব আমেরিকানদের জন্যেই

গাড়ি হচ্ছে একজন সঙ্গী। সারাক্ষণ সাথে সাথে থাকবে, কাজেই তাকে যত সুন্দর করে রাখা যায়, যত ভালো করে রাখা যায়!

তারিক দরজায় হাত দেয়ার আগেই আমজাদ সাহেব দরজা খুলে দিলেন, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটা কে?

তারিকের এক সেকেন্ড লাগল প্রশ্নটা বুঝতে—শ্যারনের কথা জিজ্ঞেস করছেন। বলল, আমাদের গ্রুপের একজন ছাত্রী। গাড়ি নিয়ে যাই নি বলে নামিয়ে দিয়ে গেল।

ও—ও! আমজাদ সাহেব তবু তীক্ষ্ণ চোখে তারিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন তারিক কিছু-একটা গোপন করার চেষ্টা করছে এবং তিনি তার চোখের দিকে তাকিয়ে সেটা বের করে ফেলবেন।

গার্লফ্রেন্ড? আমজাদ সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, লদকালদকি?

মেয়েদের, বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে তারিককে কেউ যদি ঠাট্টা করে, তারিকের ভালোই লাগে। কিন্তু আমজাদ সাহেবের ভঙ্গিটা বাড়াবাড়ি রকম নোংরা, তারিকের একটু বিরক্তি লেগে গেল। বলল, না আমজাদ ভাই, আপনি যেসব ভাবছেন সেসব কিছু না।

ভালো, তা হলেই ভালো। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, ফুর্তিফার্তা করতে চাও করে নাও, কিন্তু বিয়ে করার সময় খবরদার—দেশ থেকে বিয়ে করে আনবে, বাবা-মা যেটা ঠিক করে। এই যে আমি? চার-চারটা প্রেম করেছি, কিন্তু বিয়ে করার সময় বাবা থেটা ঠিক করেছে সেটা। হাঃ হাঃ হাঃ!

তারিকের প্রথম বার সন্দেহ হতে থাকে ভালো খাবার এবং আমজাদ সাহেবের সুন্দরী শ্যালিকাকে দেখার জন্যে চলে আসাটা সুবিবেচনার কাজ হয় নি। জিজ্ঞেস করল, আর কেউ আসবে না?

হ্যাঁ, আসবে। ফরিদ আর জামাল। আতাউরেরও আসার কথা ছিল, কাজ পড়ে গেল।

তারিক একটু মুষড়ে গেল। ফরিদ আর জামাল এই দুজনের কারো সাথেই তার সেরকম পরিচয় নেই। ফরিদ ছেলেটিকে তো সে একটু পাগলাগোছের বলেই জানে। জামাল ছেলেটি আবার একেবারে অন্য চরিত্র, আমেরিকার জলহাওয়ার সাথে পুরোপুরি মিশে গিয়েছে—কথাবার্তা চালচলনে বাঙালির কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই। সেই তুলনায় আতাউর ছেলেটি মিশুক ধরনের ছিল, কথাবার্তায় ভালো। বুদ্ধিও রাখে বেশ—আজকের দাওয়াতটি থেকে যেভাবে খসে পড়ল, সেটা থেকেই বোঝা যায়। তারিক আবার নিজেকে গালি দিল এভাবে ছুট করে চলে আসার জন্যে।

আমজাদ সাহেবের ঘরটি যত্ন করে সাজানো, কিন্তু একবার চোখ বোলালেই বোঝা যায় কোথাও কিছু-একটা গোলমাল আছে। ঘরের দুই পাশে দুই রকমের সোফা, অত্যন্ত দামী কিন্তু দু রকম। নিশ্চয়ই সেলে পেয়ে সস্তায় আলাদা আলাদা কিনেছেন। তা ছাড়াও সারা ঘরে সোনালি রঙের একটা প্রাদুর্ভাব। ছবির ফ্রেমের রং সোনালি, আয়নার ফ্রেম সোনালি, মটকার মতো বড় বড় দুটো সোনালি পিতলের

ফুলদানি এবং মাথার কাছে বড় সোনালি পিতলের ফ্রেমে কলমা লেখা একটা ফ্রেম। ঘরের এক কোনায় একটি অতিকায় বাঘের মূর্তি, সেটি শুধু সোনালি নয়, উপরে কালো ডোরা কাটা দাগ। মূর্তিটা দেখলে যে-জিনিসটি নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না, সেটি হচ্ছে এটা একটা পুরুষ বাঘ, কারণ পিছনের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে অতিকায় এক জোড়া অণ্ডকোষ ঝুলছে। কোনো মানুষ এই রকম কুৎসিত একটা প্রাণী তৈরি করতে পারে বিশ্বাস করা শক্ত। কেউ সেটা পয়সা খরচ করে কিনতে পারে সেটা বিশ্বাস করা আরো শক্ত।

তারিক সোফায় বসে টেবিলের উপর পত্রপত্রিকায় চোখ বোলাল। সেখানে পড়ার মতো কিছু নেই, শুধু দোকানপাটের ক্যাটালগ। তারই একটা টেনে নিয়ে তারিক টেবিলল্যাম্প এবং কার্পেটের বাজার যাচাই করতে থাকে। সোনালি রঙের একটা টেবিলল্যাম্প খুব সস্তায় বিক্রি হচ্ছে, একটা কিনলে আরেকটা অর্ধেক দামে ছেড়ে দেয়া হবে। আমজাদ সাহেবের বাসায় টেবিলল্যাম্পের জোড়া চলে আসতে খুব বেশি দেরি নেই মনে হচ্ছে!

আমজাদ সাহেব একটা বড় গ্লাস বোঝাই করে গাঢ় হলুদ রঙের একটা পানীয় নিয়ে হাজির হলেন। কাউকে কিছু খেতে দেবার আগে সে সেটা খেতে চায় কি না সেটা জিজ্ঞেস করা ভদ্রতা। আমজাদ সাহেব হয় সেটা জানেন না, না হয় সেটা নিয়ে মাথা ঘামান না। তারিক জিজ্ঞেস করল, এটা আমার জন্যে?

হ্যাঁ। খেয়ে দেখ। তোমার ভাবী তৈরি করেছে—আমের লাচ্ছি।

আম?

হ্যাঁ, দেশের আম থেকে হান্ড্রেড টাইমস বেটার। ল্যাংড়া আমের বাবা।

ডিনারের আগে এত বড় গ্লাসে আমের লাচ্ছি খাব?

খাও খাও। ডিনারের দেরি আছে।

তারিক আরো মুষড়ে গেল, ডিনারের দেরি আছে মানে? আরো কতক্ষণ এই যন্ত্রণার মাঝে থাকতে হবে?

আমজাদ সাহেব সামনের সোফায় বসে রিমোট কন্ট্রোলটি হাতে নিয়ে টেলিভিশনটি চালু করে নিলেন। চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটি অনুষ্ঠান খুঁজে বের করলেন, যেখানে দেখানো হচ্ছে একজন বিপত্নীক মানুষ আরেকজন বিধবাকে বিয়ে করে কী রকম বিপদে পড়েছে তার কাহিনী। প্রতি তিরিশ সেকেন্ড পরপর দর্শকদের উচ্চস্বরে হাসির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে এটা হাসির অনুষ্ঠান, এমনিতে দেখে সেটা সহজে বোঝার উপায় নেই। অনুষ্ঠানটি আমজাদ সাহেবের খুব পছন্দসই বলে মনে হল, কারণ তিনিও হাঁটু মুড়ে বসে একটু পরে পরে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করলেন।

তারিক সাবধানে ঘড়ি দেখে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

ফরিদ আর জামাল এল আরো প্রায় আধ ঘণ্টা পর। এর মাঝে আমজাদ সাহেবের স্ত্রী গাঢ় হলুদ রঙের তরলটি দিয়ে তারিকের গ্লাসটি দ্বিতীয় বার ভরে দিয়ে গেছেন।

জিনিসটি খেতে সত্যিই চমৎকার। আমজাদ সাহেবের স্ত্রী নিশ্চয়ই আমগুলিকে হাত দিয়ে চটকে চটকে এটা তৈরি করেছেন। ব্যাপারটা চিন্তা করে একটু ঘেন্না ঘেন্না লাগছিল, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে জিনিসটা খেতে ভালো। আমজাদ সাহেবও এর মাঝে প্রথম অনুষ্ঠানটি শেষ করে দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে মন দিয়েছেন। গৌফওয়ালা একজন প্রতিবেদক সমাজের জটিল সমস্যা বিশ্লেষণ করার ভান করে অত্যন্ত কুৎসিত কিছু বিষয়ের অবতারণা করছে। রগরগে জিনিস দেখে বেশ সময় কেটে যায়।

ফরিদ আর জামাল আলাদা আলাদা এলেও ঘরে ঢুকল প্রায় একসাথে। জামালের হাতে কিছু ফুল। তারিক ভেবে ভেবে মনে করতে পারল না এর আগে সে অন্য কোনো বাঙালিকে ফুল কিনতে দেখেছে কি না। সে নিজে খালিহাতে এসেছে ভেবে হঠাৎ তার একটু লজ্জা লজ্জা লাগতে থাকে।

জামাল লম্বা এবং বেশ সুদর্শন। তারিক অস্বীকার করবে না যে জামাল সুদর্শন, কিন্তু মেয়েরা যেভাবে জামালের চেহারার বর্ণনা দেয়ার সময় নিজেদের শারীরিক আকর্ষণ গোপন করার কোনো চেষ্টা করে না, সেটি বেশ বিচিত্র। মেয়েদের মুখে জামালের চেহারা এবং শরীরের প্রশংসা শুনে তারিক অন্য দশজন পুরুষের মতোই সব সময়ে ভিতরে ভিতরে ঈর্ষার খোঁচা অনুভব করেছে। তারিকের হিসেবে জামালের চেহারা আহামরি কিছু হওয়ার কথা নয়। প্রোমশ দেহ, পেশিবহুল শরীর, জোড়া ভুরু, বসখসে মুখ, বড় গোঁফ, বাঁকড়া চুল এবং প্রত্যেকটা জিনিসের মাঝে কেমন জানি জন্তু জন্তু ভাব রয়েছে, বিচিত্র কারণে মেয়েরা মনে হয় এটাকে পুরুষালি চিহ্ন হিসেবে ধরে নেয়। তারিক নিজে যে-সমস্ত মানুষকে অত্যন্ত সুদর্শন বলে জেনে এসেছে, মেয়েরা তাদেরকে মেয়েলি চেহারা বলে এককথায় নাকচ করে দেয়। সুদর্শন কথাটির অর্থ মেয়েদের এবং ছেলেদের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা।

জামালের ভাবভঙ্গি খুব সপ্রতিভ। তারিক যদি ফুল নিয়ে হাজির হত, সেটা কেমন করে দেবে সেটা নিয়ে একটু সমস্যায় পড়ে যেত। জামালের কোনো সমস্যা হল না। রান্নাঘরে ঢুকে আমজাদ সাহেবের স্ত্রীকে খুঁজে বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল। মোটাসোটা মহিলা ঘামে ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে ছিলেন, ফুলগুলি পেয়ে একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেলেন। জামাল নিজেই একটা ফুলদানি বের করে সেখানে খানিকটা পানি ঢেলে ফুলগুলি সাজিয়ে রাখতে সাহায্য করল। বলল, যা সুন্দর গোলাপ ছিল ফুলের দোকানে, কিন্তু এত দাম—হাত দেয়ার উপায় নেই! এগুলিও খারাপ না, সাথে দেবেন একটু প্লান্ট ফুড দিয়ে দিয়েছে, পানিতে মিশিয়ে দেবেন—তিন সপ্তাহে এই ফুলের কিছু হবে না। একটু থেমে যোগ করল, ভাবী, আপনার রান্নার কী খবর? সাহায্য লাগবে কিছু?

কথাবার্তার বেশির ভাগ ইংরেজিতে, কায়দাকানুন অত্যন্ত মার্জিত। এই লোককে যদি মেয়েরা পছন্দ না করে, কাকে করবে?

বসার ঘরে ফরিদ মোটামুটি মুখ ভার করে বসে ছিল। আমজাদ সাহেব রগরগে অনুষ্ঠানটি হাঁ করে গিলছেন, কথাবার্তা বলার জন্যে পরিবেশটি খুব সুবিধের নয়।

জামাল এসে রক্ষা করল। আমজাদ সাহেবকে বলল, টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিই, কী বলেন?

আমজাদ সাহেব কিছু বলার আগেই সুইচ টিপে টেলিভিশনটি বন্ধ করে বলল, টেলিভিশন চলতে থাকলে কথা বলা যায় না। আর যা বাজে প্রোগ্রাম দেখায়—যত কম দেখা যায় ততই ভালো। এই যে লোকটা প্রোগ্রাম করছে, এর নাম জিরাল্ডো। একে জেলখানায় আটকে রাখার কথা—মহা বদমাইশ ব্যক্তি।

আমজাদ সাহেব কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। জামাল তারিকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ডক্টর তারিক, ভালো আছেন? অনেকদিন পর দেখা।

ইংরেজিতে কথা হচ্ছে, তারিক তাই ইংরেজিতেই উত্তর দিল, হ্যাঁ, অনেকদিন পর।

আপনার টেলিফোন নাম্বারটা নিয়ে যাব আমি। আপনার সাথে আমার একটু যোগাযোগ রাখা দরকার।

আমার সাথে?

হ্যাঁ।

কী ব্যাপার?

আমার কাজের ব্যাপারে। আপনি তো সায়েন্টিস্ট মানুষ, সে জন্যে।

জামাল সম্ভবত একজন ইঞ্জিনিয়ার। কিসের ইঞ্জিনিয়ার তারিক ঠিক জানে না। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন আমজাদ সাহেবের স্ত্রী তার বোনকে নিয়ে হাজির হলেন, বললেন, এই যে আমার ছোট বোন মিলি। বায়োকেমিস্ট্রিতে পিএইচ. ডি. করতে এসেছে ইউ. এস. সি.-তে। খুব ভালো ছাত্রী, আমার মতো না।

আমজাদ সাহেবের স্ত্রীকে সুন্দরী বলা যায় না। কোনো একসময়ে হয়তো সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু বয়স এবং মেদে তা আড়াল পড়ে গেছে। তার বোন যে এত সুন্দরী হতে পারে তারিক কল্পনাও করে নি। শুধু যে সুন্দরী তাই নয়, চেহারায় কিছু-একটা আছে, যে-কারণে চট করে চোখ সরিয়ে নেয়া যায় না। হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি পরেছে। নূতন এসেছে এদেশে বোঝাই যাচ্ছে, না হয় এই বয়সী মেয়ে কি আর কখনো শাড়ি পরে থাকে? চোখে-মুখে প্রসাধনের কোনো চিহ্ন নেই, তাই কেমন একটা সতেজ ভাব উঁকি দিচ্ছে। আমজাদ সাহেবের স্ত্রী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, মিলি, এ হচ্ছে ফরিদ, এ হল জামাল আর ইনি হচ্ছেন তারেক। ডক্টর তারেক।

মিলির দৃষ্টি সবার উপর ঘুরে জামালের উপর ফিরে এসে সেখানেই আটকে গেল। আমজাদ সাহেবের স্ত্রী বললেন, মিলি বায়োকেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।

তুমি থামবে আপা?

মাত্র দুইটা ফার্স্ট ক্লাস ছিল এই বছরে।

মিলি বিব্রত হয়ে বলল, আপা, কী যে কর তুমি।

জামাল প্রথম বার বাংলায় কথা বলল, জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে আপনার?

উচ্চারণে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব।

মিলি উত্তর দেবার আগেই আমজাদ সাহেবের স্ত্রী বললেন, সেদিনের একফোঁটা মেয়ে, আপনি করে বলছেন কি!

জামাল এবারে আপনি তুমির ঝামেলায় না গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে?

আবার আমজাদ সাহেবের স্ত্রী উত্তর দিলেন, বললেন, কী যে মন-খারাপ, বিশ্বাস করবেন না। বলে চলে যাবে, থাকবে না এদেশে।

সে কী! জামাল সত্যি অবাক হল, ইংরেজিতে বলল, চলে যাবে কেন? প্রথম প্রথম সবার একটু খারাপ লাগে, তারপর অভ্যাস হয়ে যায়। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর ফিরে যেতে মন চাইবে না।

তারিক দেখল, মিলির চোখে-মুখে হঠাৎ কেমন জানি একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে। মুহূর্তের জন্যেই, সামলে নেয় নিজেকে আবার। তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমার ভালো লাগে না, একেবারেই ভালো লাগে না।

তারিকের মায়া হল মেয়েটির জন্যে, বলল, তুমি তো তোমার বোনের সাথে আছ, আমি এসেছিলাম একা এক ডর্মিটরিতে। কী ভয়াবহ ব্যাপার, বিশ্বাস করবে না। না পারি যেতে, না পারি ঘুমাতে, না পারি কারো সাথে কথা বলতে। আমারও সহ্য হয়ে গেল একসময়, তোমারও হবে।

মিলি দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে বলে, মনে হয় না।

ফরিদ দাঁত বের করে হাসে। হেসে হেসে বলে, শুনুন তাহলে আমার একটা গল্প।

ফরিদের গল্পটি খারাপ নয়। প্রথম এসে এক সপ্তাহ পর সে ঠিক করেছিল দেশে ফিরে যাবে, প্লেনের ভাড়া জোগাড় করার জন্যে সে কী করেছিল, সেটাই গল্পের বিষয়বস্তু। ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের কাছে কীভাবে একটা করুণ গল্প ফেঁদে বসে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল, সেটি সে খুব মজা করে বলল। ফরিদকে দেখে একটু পাগলাগোছের এবং মাঝে মাঝে স্বল্পবুদ্ধির মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু এত সুন্দর গুছিয়ে গল্পটি করল যে তারিক বেশ অবাক হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, ফরিদের গল্পটি শুনে সবাই প্রথম বার সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করল।

তারিক সন্ধে না হতেই খেয়ে নেয়। আজ খাবার দেয়া হল রাত দশটার সময়, খিদেয় তখন তার জান যায় যায় অবস্থা। ভাগ্যিস দুই গ্লাস ভরা লাচ্ছি খেয়ে রেখেছিল, না হয় এতক্ষণে তার বারোটা বেজে যেত। খাবার টেবিলে খাবার দেখে তারিক বুঝতে পারে কেন এত দেরি হয়েছে। এত রকমের খাবারের যে আয়োজন করা যায়, সেটি না দেখলে বিশ্বাস হয় না। খাবারগুলি পরিবেশনও করা হয়েছে খুব সুন্দর করে, দেখে একেবারে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ডাইনিং টেবিলটি ফুটবল মাঠের মতো। সবাই বসার পরও দুটি চেয়ার ফাঁকা রয়ে গেল। ডাইনিং টেবিল এবং চেয়ার সম্ভবত নূতন, কারণ চেয়ার এখনো প্লাস্টিকের মোড়কে ঢাকা এবং সবাই বেশ সহজভাবে তার উপর বসছে। কিংবা কে জানে আমজাদ সাহেবের সূক্ষ্ম বুদ্ধি— চেয়ারগুলি যেন ময়লা না হয়ে যায় সেজন্যে সেগুলিকে

খাওয়া শুরু করার পর প্রথম কয়েক মিনিট কোনো কথাবার্তা নেই। সবাই ভয়ানক ক্ষুধার্ত, একমনে খেয়ে চলছে। একটু পর আবার কথাবার্তা শুরু হল। তখন হঠাৎ একটি ব্যাপার ঘটল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

ফরিদ শাকসবজি খেয়ে মোরগের মাংস প্লেটে তুলে নিচ্ছে। আমজাদ সাহেব নিজে একটা মুরগির রান চিবাতে চিবাতে বললেন, নাও ফরিদ, ভালো করে নাও। সুপার মার্কেটের মুরগি না, একেবারে দেশি হালাল মুরগি।

তারিক জিজ্ঞেস করল, আপনি হালাল মুরগি কেনেন?

সব সময়। সুপার মার্কেটের মুরগি মুখে দেওয়া যায় নাকি? কেমিক্যাল দিয়ে বোঝাই করে রাখে।

জামাল জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে কেনেন?

ধাটিকোরে একটা পাকিস্তানি দোকান খুলেছে।

ফরিদ হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, পাকিস্তানি দোকান?

হ্যাঁ। আগে থেকে ফোন করে বলে দিই, গোশত কেটেকুটে রেডি করে রাখে।

ফরিদ মোরগের মাংসটা নিজের প্লেটে না নিয়ে বাটিতে ফিরিয়ে রাখল।

আমজাদ সাহেব বললেন, কী হল, নিচ্ছ না কেন?

এই তো নিচ্ছি—বলে ফরিদ খানিকটা সবজি তুলে নেয়।

আমজাদ সাহেব বললেন, মাংস নাও।

না— সবজিই ভালো। ফরিদ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে প্লেটের উপর ঝুঁকে খেতে শুরু করল।

সে কী! আমজাদ সাহেব প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, মাংস খাবে না তুমি! মুরগি? গরু? কাবাব?

না।

কেন?

সবজিই ভালো। ফরিদ কষ্ট করে একটু হাসার চেষ্টা করল।

আমজাদ সাহেব এবারে কেমন জানি একটু রেগে গেলেন। উচ্চস্বরে বললেন, কবে থেকে তুমি ভেজিটেরিয়ান হয়ে গেলে? এত কষ্ট করে সব রান্না করা হয়েছে, তুমি খাবে না মানে?

অন্যেরা খাবে। আমাকেই যে খেতে হবে সেটা কে বলেছে?

কেন খাবে না তুমি? আমজাদ সাহেব সত্যি ভয়ানক রেগে গেলেন, কেন খাবে না?

ফরিদ আমজাদ সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি পাকিস্তানি জিনিস খাই না।

আমজাদ সাহেব কথাটা বুঝতে পারলেন বলে মনে হল না। জিজ্ঞেস করলেন, পাকিস্তানি জিনিস খাও না?

না।

কেন?

শুনবেন কেন খাই না? ফরিদের গলার স্বর হঠাৎ কেঁপে ওঠে, শুনবেন?

হ্যাঁ।

নভেম্বরের উনিশ তারিখ, একাত্তর সালের নভেম্বরের উনিশ তারিখ পাকিস্তানের মিলিটারিরা এসে আমার পাঁচ ভাইকে মেরে ফেলেছিল। একসাথে। অল রাইট? আমার চোখের সামনে। পাঁচ ভাইকে। খালি আমি বেঁচে আছি। আমি পাকিস্তানিদের সহ্য করতে পারি না— পাকিস্তানি দেখলে আমার ইচ্ছা করে গলা টেনে ছিঁড়ে ফেলি। বুঝেছেন? বুঝেছেন কেন আমি পাকিস্তানি গোশত খাই না? ফরিদ প্রায় চিৎকার করে বলল, বুঝেছেন?

আমজাদ সাহেব একটা ঢোক গিলে মাথা নাড়লেন, কিছু বললেন না। কেমন জানি অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জামাল একমাত্র মানুষ, যে কাঁটাচামচ দিয়ে ভাত খাচ্ছিল, প্লেটের উপর কাঁটাচামচ রেখে ফরিদের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, আমি খুব দুঃখিত যে, তোমার পাঁচ ভাইকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছিল। খুবই দুঃখিত।

কথাটা ইংরেজিতে বলে রক্ষা। বাংলায় এ ধরনের মেকি মাপা কথা শুনলে কেমন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ফরিদ কোনো উত্তর দিল না। সবাই দেখল, সে অল্প অল্প কাঁপছে।

পরিবেশটা আশ্চর্যরকম আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারিক, জামাল এবং আমজাদ সাহেবের স্ত্রী কয়েকবার পরিবেশটা সরল করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

তারিক তার জীবনে কখনো এত ভালো খাবার এত কষ্ট করে খায় নি।

৩

ফরিদের ঠিক পিছনে একটা অতিকায় বাইশচাকার ট্রাক। ট্রাকটি একবার হাই বীম জ্বালিয়ে ফরিদকে ইঙ্গিত দিল তার সামনে থেকে সরে যেতে। ফরিদ গাড়ি চালাতে চালাতে রীয়ার ভিউ মিররে পিছনে তাকিয়ে মহা খাপ্পা হয়ে বলল, শালার ব্যাটা, ডান দিকে তো লেন খালি আছে, যা না কেন?

কথাটি ট্রাক ড্রাইভারের উদ্দেশে বলা, যদিও তার কানে পৌঁছানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। তারিক বলল, কী হয়েছে ফরিদ?

দেখেন না শালার ব্যাটার কাজকারবার! আমাকে হাই বীম দেখায়!

পিছনের ট্রাকটি আবার হাই বীম জ্বালিয়ে তার বিরক্তি প্রকাশ করল। ফরিদ হঠাৎ

ক্ষেপে গিয়ে বলল, শালা, দাঁড়া তোকে দেখাই মজা।

তারিক একটু শঙ্কিত হয়ে বলল, কী করবে?

শালাকে টাইট দিই। দেখেন মজা— কথা শেষ করার আগেই হঠাৎ ফরিদ তার গাড়ির ব্রেকে চাপ দেয়, সীট-বেল্টে আটকে পৃষ্ঠে ধাক্কা— না হয় উইন্ড শীল্ডে মাথা ঠুকে তারিকের বারটা বেজে যেত। ষাট মাইলের গাড়িকে চোখের পলকে চল্লিশে নামিয়ে আনে ফরিদ। পিছনের দৈত্যের মতো ট্রাক প্রাণপণে ব্রেক কষে অ্যাকসিডেন্ট বাঁচানোর চেষ্টা করে। ট্রাকের কর্কশ হর্নে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তারিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, কী করছ ফরিদ? কী করছ?

ফরিদ কথার উত্তর না দিয়ে আবার পিছনে তাকায়, তারপর ব্রেকে চাপ দিয়ে গাড়ির বেগ কমিয়ে একেবারে ত্রিশের কাছাকাছি নামিয়ে আনে। প্রচণ্ড হর্ন বাজিয়ে পিছনের ট্রাক প্রাণপণে ব্রেক কষে কোনোমতে পাশের লেনে সরে যায়।

ফরিদ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, বোঝ শালার ব্যাটা মজা এখন!

ট্রাকটা গতি বাড়িয়ে আসার চেষ্টা করছে, ফরিদ এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে মুহূর্তে বের হয়ে গেল। তারিক এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে ছিল, কোনোমতে বলল, কী করলে তুমি এটা? কী করলে?

ফরিদ হাসতে হাসতে বলল, ট্রাকের আঠারোটা গিয়ার। যদি কোনোদিন ট্রাক ড্রাইভারকে ক্ষেপাতে চান, তাদের সামনে ব্রেক করবেন, শালাদের একটা একটা করে গিয়ার চেঞ্জ করে আবার স্পীড তুলতে জান বের হয়ে যায়। হাঃ হাঃ হাঃ—

ফরিদের কাজকর্মের সাথে তারিকের ভালো পরিচয় নেই। হাই বীম জ্বালিয়ে সামনের লেন থেকে কাউকে সরে যাবার ইঙ্গিত দেবার জন্যে একজন ট্রাক ড্রাইভারকে এভাবে শাস্তি দেয়া যায় কে জানত! যদি ট্রাক ড্রাইভার সময়মতো ব্রেক করতে না পারত?

ফরিদের অনেক আনন্দ হচ্ছে বলাই বাহুল্য। মুখের হাসি আটকে রেখে জিজ্ঞেস করল, স্বয়ংবর পার্টি কেমন দেখলেন?

কি পার্টি?

স্বয়ংবরই তো বলে, বলে না? যেখানে মেয়েরা নিজেদের বর বেছে নেয়?

হ্যাঁ। ফরিদ কী বলতে চাইছে হঠাৎ করে তারিক আন্দাজ করতে পারে। একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, স্বয়ংবর পার্টি কেন বলছ?

কাকে কাকে ডেকেছে দেখছেন না? আপনি, আমি, জামাল আর আভাউর— চার ব্যাচেলর। হাঃ হাঃ হাঃ— মিলির জন্য জামাই খোঁজা হচ্ছে। মনে হয় নজর জামালের দিকে। জানে না তো কিছু।

কি জানে না?

জামালের কথা।

কি কথা?

সে যে কত বড় মাগীবাজ!

এ্যাঁ?

ফরিদ দুলে দুলে হাসে, জামালকে আমি পমোনা কলেজ থেকে চিনি। একসাথে আমরা কলেজে গিয়েছিলাম। বি. এস. করে আমি পিএইচ. ডি. করতে গিয়েছি, সে চাকরিতে ঢুকেছে। যখন পমোনা কলেজে ছিলাম, সব মেয়েরা আমার ঘরে এসে বসে থাকত। কেন জানেন?

কেন?

জামালের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। আপনি বিশ্বাস করবেন না—

তাই নাকি?

হ্যাঁ! চেহারা যে মেয়েদের কেমন পাগল করে আপনি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। সাদাসিধে ছেলে ছিল। তারিক ভাই, দেখতে দেখতে চোখের সামনে মাগীবাজ হয়ে গেল! হবে না কেন? আমার পিছনে মেয়েরা যদি এভাবে ঘুরে থাকত, আমিও হতাম—আপনার পিছনে ঘুরে থাকলে আপনিও হতেন।

তারিক আস্তে আস্তে বলল, ইন্টারেস্টিং! সে মনে করার চেষ্টা করে, কখনো কি হয়েছে কোনো মেয়ে তার সম্পর্কে নিজের থেকে উৎসাহ দেখিয়েছে? তারিক মনে করতে পারে না। আবার সে বুকের মাঝে একটা ঈর্ষার খোঁচা অনুভব করে।

বুঝলেন তারিক ভাই, একটা মেয়েকে বেছে নেয়। সপ্তাহখানেক তার সাথে থাকে। বড়জোর এক মাস। তারপর আরেকজন। আমজাদ সাহেব তো জানেন না— ভেবেছেন শালীকে গছিয়ে দেবেন। হাঃ হাঃ হাঃ— বলে না, বাঘ যদি মানুষের রক্তের স্বাদ পায় তখন খালি মানুষ খেতে চায়? জামাল হচ্ছে সেই বাঘ। মানুষখেকো বাঘ। মেয়েমানুষ খেকো। হাঃ হাঃ হাঃ—

ফরিদ আরো নানারকম কথা বলতে থাকে। তারিক বেশ মন দিয়ে শোনে। নিজের গাড়ি নিয়ে আসে নি বলে তারিককে সে তার বাসায় নামিয়ে দিচ্ছে। তারিক তাকে যেরকম একটু পাগলাগোছের বলে জানত, সে সত্যিই তাই। তবে স্বল্পবুদ্ধি বলে যে-ধারণাটি ছিল, সেটি সত্যি নয়। পর্যবেক্ষণক্ষমতা ভালো, আজকের পার্টিটা যে মিলির সাথে স্থানীয় অবিবাহিত ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে, সেটা হয়তো মিথ্যা নয়।

আমজাদ সাহেব আর জন্মেও আমাকে তাঁর বাসায় ডাকবেন না। কি বলেন?

মনে হয়।

আমোকা বাওয়াটা নষ্ট হল।

তোমার দোষ ছিল না।

হ্যাঁ! আমি তো বলতে চাই নি। শালা জোর করল।

তোমার পাঁচ জন ভাই একসাথে মারা গিয়েছিল, ইস।

হ্যাঁ। হঠাৎ করে ফরিদের মুখ শক্ত হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে, শালার ব্যাপারটা

কিছুতেই ভুলতে পারি না। খালি চোখের সামনে ভাসে। দেয়ালের সামনে দাঁড়া করিয়ে শুওরেরবাচ্চারা— ফরিদ হঠাৎ কথা বন্ধ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়।

তারিক একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। ফরিদের কাঁধ স্পর্শ করে বলে, থাক ফরিদ থাক। অন্য কিছু আলাপ করা যাক। আমি আসলে বুঝতে পারি নি। বোকার মতন কথাটা আবার তুলে ফেললাম—

একটা গুলি দিয়েই একজন মানুষকে মারা যায়। শুওরের বাচ্চারা গুলি করে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলল—আমার বড় ভাইয়ের খুলি ফেটে— খুলি ফেটে—

তারিক আবার ফরিদের হাতে হাত রেখে বলল, ফরিদ, এখন থাক। এখন থাক—

আমার মা পাঁচটা ছেলের পাঁচটা লাশ নিয়ে বসে রইল। কাঁদতেও ভুলে গেছে। আমার মনে হল, ইস, কেউ যদি মাকে মেরে ফেলত! ছোট ছিলাম আমি, যদি বড় হতাম, তাহলে গলা টিপে মাকে মেরে ফেলতাম— গলা টিপে—

ফরিদ কথা বন্ধ করে স্টিয়ারিং হুইলটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয়। গাড়িটা বিপজ্জনকভাবে তাল হারিয়ে পাশের লেনে চলে গিয়ে আবার আগের লেনে ফিরে আসে, ভাগ্যিস আশেপাশে কোনো গাড়ি নেই।

তারিক ব্যস্ত হয়ে বলল, ফরিদ, তুমি গাড়িটা থামাও। থামাও এই শোভারে—

সেই শুওরের বাচ্চা পাকিস্তানি দোকানের গোশত খাওয়াবে আমাকে! আমি যে খাবারে পিশাব করে দেই নাই সেটা শালার চান্দপুরুষের ভাগ্য— ফরিদ আবার স্টিয়ারিং হুইল ধরে ঝাঁকুনি দিতেই গাড়িটা বিপজ্জনকভাবে ঘুরে আসে।

তারিক আরেকবার চেষ্টা করল, ফরিদ, অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে, তুমি একটু শান্ত হও। না হয় থামাও পাশে—

ফরিদ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাক মুছে বলল, না তারিক ভাই, ঠিক আছে। কিছু হবে না। আমি ঠিক আছি। ঠিক আছি।

সত্যি সত্যি সে নিজেকে সামলে নিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তারিক ভাই, আমার মাথার মাঝে কিছু-একটা গোলমাল হয়ে গেছে। নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না। মাঝে মাঝে কী যে হয়, মনে হয় সবকিছু ভেঙেচুরে শেষ করে দিই—

হতেই পারে ফরিদ। তুমি যে-অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়েছ, আমি হলে তো মনে হয় পাগলই হয়ে যেতাম!

মাঝে মাঝে মাথা ব্যথায় ফেটে যেতে চায়, চোখ খুলে তাকাতে পরি না, মাথার মাঝে শুধু সেই দৃশ্যটা ভাসে স্লো মোশানে, বারবার— বারবার— বারবার। যখন একেবারে সহ্য হয় না, তখন কী করি জানেন?

কী?

খুব একটা ব্যস্ত ক্রস সেকশানে লাল বাতির ভিতর দিয়ে আশি-নব্বই মাইলে

গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাই—

কী বললে! তারিকের নিজের কানকে বিশ্বাস হল না, কী বললে তুমি?

খুব একটা ব্যস্ত ক্রস সেকশানে লাল বাতির মাঝে বের হয়ে যাই।

কেন?

আমার নার্ভ শান্ত করার এই একটাই উপায়।

কিন্তু মরে যাবে তো কোনো দিন।

মনে হয়। কিন্তু কী করব বলেন? আশি-নব্বই মাইল বেগে যখন ছুটে যাই, দুই পাশ থেকে গাড়ি আসছে, সেই টেনশানটা ভয়ংকর টেনশান, সেটা ব্রেনের মাঝে কিছু-একটা করে। মাথাব্যথাটা কমে আসে। ফিরে এসে একটা লম্বা ঘুম দিই।

তুমি সত্যিই এটা কর?

হ্যাঁ।

কতবার করেছ?

অনেকবার।

কিন্তু একদিন তো মারা পড়বে!

কিন্তু কী করব আমি?

ডাক্তারের কাছে গিয়েছ? এসবের তো চিকিৎসা আছে।

নেই। এসবের চিকিৎসা নেই। ঘুমের ওষুধ খেয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকি, সেটা কি চিকিৎসা হল? এই রোগের একটাই চিকিৎসা, কেউ যদি আমাকে একটা কুড়াল দিত আর সেই পাকিস্তানি মিলিটারিগুলিকে ধরে দিত, কুপিয়ে কুপিয়ে যদি তাদের মাথার খুলি ফাটিয়ে মিলু বের করে দিতাম, তা হলে চিকিৎসা হত। এ ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই।

তারিককে বাসায় নামিয়ে দিয়ে ফরিদ চলে গেল, এক কাপ চা কিংবা কফি খেয়ে যেতে বলেছিল, ফরিদ রাজি হল না। রাতে নাকি সে চা কফি বেশি খেতে চায় না।

তারিক রাতে বিছানায় শুয়ে দীর্ঘ সময় ফরিদের কথা ভাবল। একজন মানুষকে দেখে তার ভিতরের কথা কিছুই বোঝা যায় না। খানিকটা পাগলাগোছের এই ছেলেটিকে দেখে কে বলবে ভিতরে এরকম ভয়ংকর যন্ত্রণা। অস্থিরতা দূর করার জন্যে সে ব্যস্ত রাস্তার ক্রস সেকশানে লাল বাতির মাঝে আশি-নব্বই মাইল বেগে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়— কী সর্বনাশা কথা! আজকেও কি যাবে?

তারিক হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে। আমজাদ সাহেবের বাসায় একবার ক্ষেপে উঠেছিল ফরিদ, গাড়িতে আরেকবার। তাকে যখন নামিয়ে দিয়েছে, কথাবার্তা বলছিল না বেশি, চা খেতেও নামে নি।

এখন কি যাবে সে তার গাড়ি নিয়ে?

তারিক খানিকক্ষণ ইতস্তত করে তার টেলিফোন বই বের করে ফরিদের

টেলিফোন নাম্বারটি বের করে তাকে ফোন করল। সাতবার রিং হওয়ার পর টেলিফোন ধরল ফরিদ, ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, হ্যালো—

ফরিদ, আমি তারিক।

ও, তারিক ভাই? কি ব্যাপার?

না—আমি আসলে—তারিক একটু লজ্জা পেয়ে গেল, ইতস্তত করে বলল, আমি আসলে ফোন করলাম দেখার জন্যে তুমি ঠিক ঠিক বাসায় পৌঁছেছ কি না। মনে হচ্ছিল আবার যদি রেড লাইটের ভিতর দিয়ে—

হাঃ হাঃ হাঃ— ফরিদ শব্দ করে হেসে উঠে বলল, না তারিক ভাই, আজকে যাই নি।

তেরি গুড। থ্যাংকো তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম মাঝরাতে।

কোনো সমস্যা নেই—আবার ঘুমিয়ে যাব আমি।

হ্যাঁ, ঘুমিয়ে যাও। আর আরেকটা জিনিস—

কি?

আবার যদি কোনোদিন তুমি রেড লাইটের ভিতর দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যেতে চাও, আমাকে একবার ফোন করবে।

আপনাকে?

হ্যাঁ।

ফরিদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে।

কথা দিচ্ছ?

দিচ্ছি।

এখন তাহলে ঘুমাও। সরি, তোমাকে এত রাতে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম।

না না, কিছু না। আপনিও ঘুমান।

টেলিফোন রেখে বিছানায় শুয়ে তারিক প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে গেল।

৪

জামাল তারিককে ফোন করে বলেছিল, সে সাড়ে দশটায় আসবে, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় সে একটি আমেরিকান মেয়েকে নিয়ে হাজির হল। মেয়েটির লম্বা সোনালি চুল, নীল চোখ এবং আমেরিকান ধাঁচের একটু লম্বাটে মুখ। বাড়াবাড়ি রকমের সুন্দরী নয়, কিন্তু সুন্দর করে সেজে আছে বলে বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে। দেখে বোঝা যায় মেয়েটি স্কুল-কলেজের ছাত্রী নয়। দামী স্কার্ট, চকচকে জুতো, চামড়ার ব্যাগ— নিশ্চয়ই কোথাও কাজ করে। জামাল মেয়েটির সাথে তারিকের পরিচয় করিয়ে দিল— নাম ন্যান্সি। একটা ব্যাংকে কাজ করে। ন্যান্সি মেয়েটির কথাবার্তা

ভাবভঙ্গিতে একটা আদুরে বিড়ালের ভাবভঙ্গি আছে, সারাক্ষণ সে জামালের গায়ের সাথে একেবারে আঠার মতো লেগে রইল।

জামাল আগের দিন ফোন করে সময় ঠিক করেছিল, তারিকের সাথে একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চায়। কি ব্যাপার পরিষ্কার করে বলে নি, তার অফিসের কোনো-একটা কাজ, সেরকম ইঙ্গিত দিয়েছে। তারিক তার অগোছালো অফিসে ঠেলেঠুলে দু'টি খালি চেয়ার পেতে বলল, তারপর, হঠাৎ করে কী মনে করে?

একটা কাজে এসেছি। আমি যেখানে কাজ করি সেটাকে সবাই ঠাট্টা করে বলে গুয়ের কারখানা।

কিসের কারখানা?

গু—মানে পায়খানা।

ন্যান্সি জামালকে কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিয়ে মুখে হাত চেপে হেসে ফেলল। তারিক চোখ বড় বড় করে বলল, পায়খানা তৈরি করতে কারখানা লাগে সেটা তো জানতাম না।

জামাল শব্দ করে হেসে বলল, তৈরি করতে লাগে না, কিন্তু সেটার গতি করতে লাগে। আসলে ঠিক পায়খানা নয়, আমাদের কোম্পানি হচ্ছে বড় ধরনের রাসায়নিক জঞ্জাল, বিষাক্ত কেমিক্যাল— এইসব পরিষ্কার করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, আমরা তাই ঠাট্টা করে সব রকম জঞ্জালকে সোজা কথায় পায়খানা বলি।

তাই বলেন।

এবারে আমাদের কোম্পানি একটা খুব বড় অর্ডার পেতে পারে। একটা অনেক পুরানো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর পরিষ্কার করা। সেখানে নানারকম তেজস্ক্রিয় জিনিসপত্র আছে, সেগুলিকেও সরাতে হবে। কোম্পানির হেড অফিস থেকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে চিঠি এসেছে, কারা কারা তেজস্ক্রিয় জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করতে চায়। সবাই না করে দিয়েছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমরা তো এ লাইনের মানুষ নই, তেজস্ক্রিয় কথাটি শুনলেই কেমন জানি ভয়-ভয় লাগতে থাকে। শুধু মনে হয় খাসি হয়ে যাব।

খাসি হয়ে যাবেন? তারিক অবাক হয়ে বলল, খাসি হয়ে যাবেন মানে?

ও আপনি শোনেন নি? বলা হয়ে থাকে তেজস্ক্রিয় জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করলে মানুষ নপুংশক হয়ে যায়।

ন্যান্সি কনুই দিয়ে জামালকে বেশ জোরে একটা গুঁতো দিয়ে বলল, খুব ভয় মনে হচ্ছে তোমার?

জামাল গুঁতোটি সহ্য করে আবার তারিককে বলল, আপনার কাছে আমি এসেছি একটু পরিষ্কারভাবে জানার জন্যে ব্যাপারটা কি। এই তেজস্ক্রিয় জিনিসপত্রে আসলেই ভয় আছে কি? থাকলে কী রকম ভয়। যদি ঠিকভাবে নিজেকে সাবধানে রাখা হয়, কোনো ক্ষতি হতে পারে কি না— এইসব। বুঝতেই পারছেন কোম্পানির যে অবস্থা,

আমি যদি এখন এই কাজটা নিই, তা হলে একেবারে চোখ বন্ধ করে প্রমোশন।

তাই বলেন! তারিক একগাল হেসে বলল, আমাকে আধা ঘন্টা সময় দেন, আপনাকে আমি একটা ছোটখাটো তেজস্ক্রিয় বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দেব।

জামাল খুশি হয়ে বলল, তা হলে তো কোনো কথাই নেই!

তারিক তখন জামালকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপর একটা লম্বা লেকচার দিল। অফিসের হোয়াইট বোর্ডে মার্কার দিয়ে নানারকম ছবি এঁকে দেখাল, সংখ্যা, মাত্রা বিশেষত্ব লিখে দিল। জামাল গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে লেকচারটি শুনল। পকেট থেকে নোটবই বের করে বিভিন্ন তথ্য টুকে নিল। লেকচার শেষ করে তারিক জামাল আর ন্যান্সিকে নিচে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেল তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেখানোর জন্যে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সে দেখাল কোনটা কী রকম, কোনটার কী ধরনের ক্ষতি করার ক্ষমতা, কোনটা থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে হয়, কোনটা কীভাবে মাপতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবকিছু দেখেশুনে জামালের চোখ চকচক করতে থাকে উত্তেজনায়, তারিকের সাথে শক্ত করে হাত মিলিয়ে বারবার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, ওহ্! আপনি যে আমার কী উপকার করলেন কী বলব।

কেন?

এই প্রথম বার আমার ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা ধারণা হল, পরিষ্কার একটা ধারণা হল। অস্ত একটা ভয় ছিল আগে, ভয়টা কেটে গেছে। আগে ভাবতাম তেজস্ক্রিয় জিনিস মানেই সাংঘাতিক কিছু, এখন জেনে গেলাম মহাকাশ থেকে কসমিক রে আমাদের শরীরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে সব সময়। এখন আর ভয় পাব না। মনে করব না তেজস্ক্রিয় জিনিসের কাছে গেলেই সীসা দিয়ে তৈরী একটা আন্ডারওয়ার পরে যেতে হবে—

ন্যান্সি আবার কনুই দিয়ে একটা খোঁচা মেরে বলল, থাম দেখি! তোমার খালি বাজে কথা।

জামাল খোঁচাটি হাসিমুখে সহ্য করে বলল, এবারে আমার প্রমোশন আটকায় কে?

তারিক বলল, যখন আপনার প্রমোশন হবে আমাকে একপেট খাইয়ে দেবেন।

একপেট কী বলছেন! আপনাকে আমি হাওয়াই নিয়ে যাব! বাহামা নিয়ে যাব! ইউরোপ নিয়ে যাব!

ন্যান্সি বলল, এই যে আমি সাক্ষী থাকলাম। যদি না নিয়ে যাও, দেখো আমি কী করি তোমার অবস্থা!

ল্যাবরেটরি থেকে বের হয়েই জামাল একটু গম্ভীর হয়ে গেল, ন্যান্সি একটু আদুরে গলায় বলল, কি হল জামাল! তোমার মুখ এত ভারি কেন হঠাৎ?

জামাল বলল, তোমার সাথে আমার একটা কথা বলার ছিল।

কি কথা?

কোথাও বসে বলতে হবে সেটা।

ন্যান্সি পথে পা ছড়িয়ে বসে তরল গলায় বলল, এই যে বসে গেলাম।

জামাল হাত ধরে টেনে তুলে বলল, ঠাট্টা না, সত্যি বলছি।

কী এমন কথা যে তুমি না বসে বলতে পারবে না?

আছে।

ঠিক আছে চল, তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। দারুণ একটা রেস্টুরেন্ট। খেতে খেতে কথা হবে। সীফুড ভালো লাগে তোমার?

নাহ্! মাছের আঁশটে গন্ধ বড় খারাপ লাগে।

তা হলে চল মেক্সিকান খাই। মেক্সিকান কেমন লাগে?

ভালো। ঝাঁজটা একটু বেশি দেয়।

বলে দেব, তোমাকে কম করে দেবে।

রেস্টুরেন্টটা চমৎকার। খাবার খুব ভালো, কিন্তু খাবার মাঝখানে গিটার নিয়ে কিছু মানুষ উচ্চস্বরে স্প্যানিশ ভাষায় গান গাইতে থাকে, সেটাই হচ্ছে সমস্যা। এর মাঝেও দু' জনে খুব তৃপ্তি করে খেল। খাবারের শেষের দিকে জামাল বলল, ন্যান্সি, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।

কি কথা?

কীভাবে শুরু করব, ঠিক বুঝতে পারছি না।

জামালের গলার স্বরে কিছু-একটা ছিল, ন্যান্সি হঠাৎ একটু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভীত গলায় বলে, কী বলতে চাও তুমি?

যখন তোমার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমাদের সম্পর্ক হবে হালকা, এর মাঝে কোনো গভীরতা আসতে পারবে না। মনে আছে?

আছে।

তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি আমাদের সম্পর্কটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছ। ভুল বলেছি?

তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?

আমি কোনোরকম সিরিয়াস সম্পর্ক বিশ্বাস করি না।

কেন?

আমি— আমি— বলতে পার একজন পশুপ্রকৃতির লোক। আমার ভিতরে প্রেম-ভালবাসা এসব কিছু নেই। শরীর ছাড়া আমি কিছু কিছু বুঝি না। কয়দিন থেকে লক্ষ করছি, আমার ব্যাপারে তুমি খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ছ। মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভালবাসতে শুরু করেছ—

জামাল—

আমাকে শেষ করতে দাও। আমি দেখেছি, তুমি আজকাল প্রেম-ভালবাসার কথা বল। এটা ঠিক নয় ন্যান্সি, এটা একেবারে ঠিক নয়। আমার জন্যে কেউ যেন দুঃখ না পায়।

জামাল—

আমার মনে হয় আমাদের দু' জনের সম্পর্কটা এখানেই শেষ করে দেয়া ভালো। সবচেয়ে ভালো হয় আর যদি আমাদের দেখা না হয়।

ন্যান্সি হঠাৎ জামালের হাত ধরে ফেলল, কাতর গলায় বলল, জামাল, তুমি এরকম করে কথা বলো না, প্লীজ।

জামাল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ন্যান্সি, বিশ্বাস কর, আমি খুব নিচুস্তরের একটা পশুর মতো। আমার ভিতরে প্রেম-ভালবাসা নেই—

জামাল! আমার বুকভরা ভালবাসা, তোমার না থাকলে আমি আমারটা দিয়ে তোমারটা পুষিয়ে নেব।

ন্যান্সি, সুন্দর করে কথা বললেই কথা সত্যি হয়ে যায় না।

জামাল, আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি। নিজেকে মানুষ যত ভালবাসে তার থেকে হাজার গুণ বেশি ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না, তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। প্লীজ—

ন্যান্সি, এটা সত্যি কথা নয়। আমি অনেকবার এই কথা শুনেছি। অনেকে বলেছে যে তারা আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না, আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। সবাই চমৎকার বেঁচে আছে। সবাই সুখে আছে। আমাকে নিয়েই কেউ সুখী হত না। আমি খুব স্বার্থপর নীচ মনের মানুষ—

জামাল! বিশ্বাস কর আমার কথা—বিশ্বাস কর—আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। বিশ্বাস কর বিশ্বাস কর—

আমি তোমাকে বিশ্বাস করি ন্যান্সি। কিন্তু তোমারও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। জামাল ন্যান্সির চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে স্পষ্ট কাটা কাটা স্বরে বলল, তোমার জন্যে আমার এতটুকু ভালবাসা নেই ন্যান্সি। কারো জন্যে নেই। কখনো ছিল না।

জামালের চোখের দিকে তাকিয়ে ন্যান্সি হঠাৎ কেঁপে ওঠে। পাথরের মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে খানিকটা অনুকম্পা, খানিকটা বিতৃষ্ণা এবং খানিকটা ঘৃণা। কিন্তু সেখানে কোনো ভালবাসা নেই। এতটুকু ভালবাসা নেই।

ন্যান্সি হঠাৎ করে বুঝতে পারে, জামাল সত্যি কথা বলছে। এই অসম্ভব সুদর্শন মানুষটির বুকে কোনো ভালবাসা নেই। তার চোখে পানি এসে যায় হঠাৎ। প্রাণপণে সে চোখের পানিকে আটকে রাখার চেষ্টা করে, এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষটির সামনে সে কাঁদতে চায় না। কিছুতেই কাঁদতে চায় না।

কিছুতেই না।

৫

তারিককে দেখে সেক্রেটারি সারা বলল, তোমাকে একজন পাগলের মতো খোঁজ করছে।

কে?

নাম গ্রেন লিভিংস্টোন।

সেটা কে?

আমি তো জানি না। ভেবেছিলাম তুমি জান।

না, আমিও জানি না। টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে?

না, দিতে চাইল না। বলেছে, আবার ফোন করবে।

বেশ।

তরিক তার মেলবক্স থেকে চিঠিগুলি নিয়ে চোখ বোলায়। রাজ্যের সব জঞ্জাল এসে হাজির হয় রোজ। বেছে বেছে পরিষ্কার করতে করতে দেখতে পেল দেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। চিঠি লিখেছে গোলাম মোস্তফা সরকার নামে একজন মানুষ। নাম দেখে মানুষটাকে চিনতে পারল না, খাম খুলে চিঠিটা বের করল, ভিতরে সংক্ষিপ্ত একটা চিঠি:

বাবা তারিক

আমার দোয়া নিবা। পর সমাচার এই যে, দীর্ঘদিন তোমার সহিত যোগাযোগ নাই। আশা করি তুমি কুশলেই আছ।

তুমি টেলিভিশনে আমার গণমুক্তি সংস্থাটি সম্পর্কে অনুষ্ঠানটি নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই সংস্থাটি সম্পর্কে একটি বিশেষ বক্তৃতা দিবার জন্য আমি আমেরিকা আসিতেছি। আমি ইতঃপূর্বে কখনোই দেশের বাহিরে পদার্পণ করি নাই বলিয়া বিশেষ চিন্তাযুক্ত রহিয়াছি। আমার পাসপোর্ট তৈরি হইয়াছে, এ ব্যাপারে আমার প্রাক্তন ছাত্র ইদরিস আলি বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। গতকল্য রেজিস্ট্রি চিঠি মারফৎ আমার টিকিট আসিয়াছে। আমি আগামীকল্য বিমানের ভিসা লইতে ঢাকা যাইব। আমি চিঠির অপর পৃষ্ঠায় তোমাকে বিমানের ফ্লাইট নম্বর জানাইয়া দিলাম। তুমি অবশ্যই বিমানবন্দরে থাকিবা।

বিশেষ আর কি লিখিব? পত্রপাঠ উত্তর দিয়া আমাকে চিন্তামুক্ত করিবা।

ইতি
তোমার শিক্ষক
গোলাম মুস্তফা সরকার বি. এ

তারিক চিঠিটা দ্বিতীয় বার পড়ল। মানুষটিকে চিনতে পেরেছে, সরকার স্যার—তার একেবারে শৈশবের একজন শিক্ষক। শৈশবের সব শিক্ষকের মাঝে শুধু সরকার স্যারের কথাই তারিকের ভালো করে মনে আছে। একটু আধপাগলাগোছের মানুষ ছিলেন। উৎসাহী সমাজকর্মী বলতে যা বোঝায় মোটামুটি তাই। দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এই ধরনের ব্যাপারগুলি না থাকলে স্যারের সময় কেমন করে কাটত কে জানে! সমাজসেবামূলক জিনিসগুলিতে বেশি সময় দেওয়ায় পরিবারে বড় ধরনের অশান্তি ছিল। ছেলেপিলে মানুষ হয় নি। বড় মেয়েটা পালিয়ে বিয়ে করে ফেলেছিল একজন ওয়াটার পাম্পের মেকানিককে। একটি ছেলে যাত্রাদলে ভিড়ে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। সরকার স্যার আসলে সাংসারিক মানুষ ছিলেন না। সংসারের অশান্তি তাঁকে স্পর্শ করত বলে মনে হয় না। অনেকদিন আগের কথা। এতদিনে বুড়ো হয়ে মোটামুটি অচল হয়ে যাবার কথা, কিন্তু তিনি নাকি আমেরিকা আসছেন! একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

তারিক চিঠিটা তৃতীয় বার পড়ে ফেলল। 'অর্থাভাবে দিন কাটছে না, কিছু টাকা পাঠাও'— এ ধরনের চিঠির জন্যে সে প্রস্তুত, কিন্তু 'আমেরিকা আসছি—এয়ারপোর্টে থেকো'— এটা তো একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। সরকার স্যারের আমেরিকা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। ধরে নিয়েছেন 'গণমুক্তি' নামে তিনি যে-সংস্থাটি চালাচ্ছেন, তারিক আমেরিকা বসে সেটি দেখেছে! তারিক মোটামুটি নিঃসন্দেহ ছিল সরকার স্যার আমেরিকার এমন একটি শহরে আসছেন, যেটি লস এঞ্জেলস শহর থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে এবং তার সেই এয়ারপোর্টে হাজির থাকার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। কিন্তু দেখা গেল সরকার স্যার লস এঞ্জেলস শহরেই আসছেন। তারিক মোটামুটি নিঃসন্দেহ, এটি সরকার স্যারের কপাল যে তিনি অন্য কোনো শহরে না গিয়ে লস এঞ্জেলস শহরেই আসছেন।

তারিক তখন-তখনই সরকার স্যারকে সাহস দিয়ে একটা লম্বা চিঠি লিখে দিল। বাংলায় সে গুছিয়ে লিখতে পারে না, কিন্তু সরকার স্যারকে ইংরেজিতে একটা চিঠি লেখা সম্ভবত সুবিবেচনার কাজ হবে না। স্কুলে সে সরকার স্যারের কাছে বাংলা পড়েছে।

তারিক যখন চিঠির শেষ পর্যায়ে এসেছে, তখন গ্লেন লিভিংস্টোন নামের সেই ব্যক্তিটি আবার তাকে ফোন করল। মানুষটির কথা বলার ভঙ্গি খুব সুন্দর, শুরু করল এভাবে, ডক্টর তারিক, আমার নাম গ্লেন লিভিংস্টোন, আমি সাইকলের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর। আমাকে তুমি গ্লেন বলে ডাকতে পার। তোমার সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই। কোন সময়টা তোমার জন্যে সুবিধেজনক?

এখনই বলতে পার।

তুমি নিশ্চিত যে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না?

আমি নিশ্চিত।

তোমার সাথে আমার একবার দেখা হয়েছিল।

সত্যি?

হ্যাঁ। এ. পি. এস.-এর মীটিংয়ে। তোমার নিশ্চয়ই মনে নেই তোমার সেমিনারটির পর আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, খুব ভালো সেমিনার হয়েছে।

তাই নাকি? আমার মনে নেই।

মনে থাকার কথাও না। অনেকেই বলেছিল।

তোষামুদির কথা। তারিক শুনে একটু খুশিই হল। গ্লেন লিভিংস্টোন বলল, তুমি যে-বিষয়ের উপরে সেমিনার দিয়েছিলে সেটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমি সেটা নিয়ে আলাপ করার জন্যে ফোন করি নি। আমি অন্য একটা জিনিস জানতে চাই।

কি জিনিস?

তুমি বলেছিলে জিনন গ্যাসে যে সিন্টিলেশান হয় তার একটা সেকণ্ডারি পীক আছে।

হ্যাঁ, বলেছিলাম।

সেটা কি তুমি কোনো জার্নালে পাবলিশ করেছ?

না। পাবলিশ করার মতো কিছু না। কোথাও-না-কোথাও এটা আছে।

নেই। আমরা মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট তৈরি করি। ঐ রেঞ্জের সিন্টিলেশানে আমাদের খুব ইন্টারেস্ট। আমি জানি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তুমি এমন একটা জিনিস বের করেছ, যেটার কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট আছে। মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টের বিজনেস কত বিলিওন ডলারের— কাজেই আমাদের খুব ইন্টারেস্ট। তুমি কি তোমার আবিষ্কারটা পেটেন্ট করার কথা ভেবেছ?

আবিষ্কার? ওটাকে আবিষ্কার বলছ? কী একটা যন্ত্রণা—পুরো এক্সপেরিমেন্ট ধসে যায় সেরকম অবস্থা।

গ্লেন লিভিংস্টোন শব্দ করে হাসল। বলল, তুমি তোমার এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ভাববে, আমি ভাবব আমার বিজনেস। তোমার কাছে যন্ত্রণা আমার কাছে আবিষ্কার! তুমি কি পেটেন্টের কথা ভেবেছ?

পেটেন্ট?

হ্যাঁ।

আমি যতদূর জানি ইউনিভার্সিটি সহজে কিছু পেটেন্ট করতে চায় না, অনেক খরচ হয়। ইউনিভার্সিটি কুলিয়ে উঠতে পারে না।

কিন্তু বাইরের কোনো ইন্ডাস্ট্রি যদি ইন্টারেস্ট দেখায়?

তারিক মাথা চুলকে বলল, তা হলে অবশ্যি ভিন্ন কথা।

তোমার সাথে সেটা নিয়ে এবং আরো কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু খোলাখুলি কথা বলতে চাই।

আর কি বিষয়?

এই তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আমাদের কোম্পানিতে একটা রিসার্চ ডিভিশান শুরু করতে চাও কি না, এই ধরনের কথাবার্তা। আমাকে খানিকটা সময় দিতে পারবে?

অবশ্যি।

কখন তোমার সময় হবে?

যখন ইচ্ছে। আমার ঘড়ি ধরে কাজ করতে হয় না।

সামনের সপ্তাহে? শুক্রবার?

ঠিক আছে।

তা হলে সামনের শুক্রবারে আমরা একসাথে লাঞ্চ করব।

লাঞ্চ? তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?

নিউ ইয়র্ক।

তা হলে?

আমি লস এঞ্জেলস চলে আসব।

আমার সাথে দেখা করার জন্যে, নাকি অন্য কাজ আছে?

তোমার সাথে দেখা করার জন্যে।

সে কী!

গ্রেন লিভিংস্টোন শব্দ করে হেসে উঠে বলল, ডঃ তারিক, তোমরা ইউনিভার্সিটিতে কম বাজেটে অনেক বড় বড় কাজ করে ফেল। আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে থাকি, চোখ-কান খোলা রেখে তোমাদের জন্যে বসে থাকি। তুলিয়েভালিয়ে কোনোভাবে তোমাদের অ্যাকাডেমিক লাইন থেকে সরিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে আসতে চাই।

টেলিফোনটা রেখে তারিক খানিকক্ষণ গ্রেন লিভিংস্টোনের কথা ভাবল। খারাপ হয় না ব্যাপারটা। কিছুদিনের মাঝেই তার একটা পাকা চাকরি খোঁজার কথা। না খুঁজেই যদি চাকরিটা হাতে চলে আসে, খারাপ কি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এত মজার কাজ হয়তো হবে না, কিন্তু মোটা বেতনেরও তো একটা লোভ আছে।

দুপুরে জনের পেপারটার ইংরেজি শুদ্ধ করার সময় তারিক কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক কথাবার্তাও শুদ্ধ করে দিল। তার কাছে যেসব জিনিস অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলি লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে পাশে বড় বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিল। জন পেপারটি হাতে নিয়ে একনজর দেখে বলল, তোমাকে ইংরেজি শুদ্ধ করতে বলেছিলাম, তুমি দেখছি অন্যান্য জিনিসেও নাক গলিয়েছ।

তারিক একটু উষ্ণ হয়ে বলল, নাক আছে তাই গলিয়েছি। পেপারে আমার নামও আছে।

কিন্তু এটা আমার পেপার।

চমৎকার! তাহলে তোমার নামই রাখ। আমারটা কেটে দাও। কোনোরকম ধাক্কাধাক্কির মাঝে আমি নেই।

ধাক্কাধাক্কির কী দেখলে?

পুরোটাই ধাক্কাধাক্কি। এখান থেকে কিছু মেরেছ, ওখান থেকে কিছু মেরেছ। এসব অভ্যাস ভালো না জন। আমার নামটা যখন কেটে সেলে তখন আমার কাছ থেকে যেটুকু মেরেছ, সেটাও কেটে দিও। ঠিক আছে?

জনের গাল অপমানে লাল হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, তুমি প্রথম যখন এসেছিলে, খুব ভালো স্বভাবের ছিলে। আস্তে আস্তে তোমার মেজাজ রুক্ষ হয়ে গেছে। খুব কড়ভাবে কথা বল আজকাল।

তারিক একটু লজ্জা পেয়ে যায়। মুখে হাসি টেনে এনে বলে, আমি দুঃখিত জন। দোষটা কিন্তু তোমার। তুমি যদি শুরু না করতে আমি কিছু বলতাম না। তারিক হঠাৎ সুর করে গাইল—

আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি—

জন চোখ বড় বড় করে বলল, এটা আবার কী বললে?

একটা গান গাইলাম।

কি গান?

আমাদের দেশে যখন যুদ্ধ হয়েছিল, সে-সময়ের গান।

এখন কেন গাইছ? তোমার গলায় খুব সুর আছে মনে হল না।

গানটাতে আমাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করা আছে, তাই গাইলাম।

কথাগুলি কি, অনুবাদ করে শোনাও দেখি!

তারিক বলল, তোমার জন্যে যদি অনুবাদ করা হয় তা হলে এভাবে অনুবাদ করতে হবে, আমি এমনিতে ভালোমানুষ, কিন্তু আমার পাঁদে আঙুল দিও না, তা হলে তোমার দাঁত ভেঙে ফেলব—

জন এক মুহূর্ত তারিকের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর পেট চেপে ধরে হা-হা করে হাসতে শুরু করে।

ক্যাফেটারিয়াতে সবাই যাচ্ছে। প্রফেসর বিল ইয়ং, জন, জিম, ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড, শ্যারন এবং তারিক। শ্যারন এই সময়টাতে সাধারণত দৌড়াতে যায়। শরীরকে ঠিক রাখার জন্য তার চেষ্টার কোনো অন্ত নেই। আজ সেও আছে ক্যাফেটারিয়াতে। সবাই যখন থালা গাদা খাবার নিয়ে খেতে বসে, শ্যারনের প্লেটে থাকে ঘাস লতাপাতাজাতীয় কিছু সালাদ। এ নিয়ে তাকে নানারকম হাসি-তামাশা করা হয়, সে কখনো গা করে

নি।

খেতে বসে কখনো জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা হয় না, সব সময়ই কাউকে-না-কাউকে বদনাম করা হয়। অঙ্ক ধরা হয়েছে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডীনকে। তাঁর সম্পর্কে রসালো গল্প করছে ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড। রিচার্ডের গল্প করার ভঙ্গিটি খুব ভালো, শুনে সবাই হেসে একেবারে কুটিকুটি হয়ে যাচ্ছে। প্রফেসর বিল খুব হাসছেন, কিন্তু গল্পে যোগ দিচ্ছেন না, সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডীন তাঁর অনেক দিনের সহকর্মী, বন্ধু।

বদনামে একটু ভাটা পড়তেই জন বলল, তারিকের দেশে যখন যুদ্ধ হয়েছিল, তখন তারিক কী গান গাইত তোমরা জানো?

কী গান?

জন গান গাইবার ভঙ্গি করে উচ্চস্বরে বলল,

আমার পোঁদে আঙুল দিও না

তা হলে দাঁত ভেঙে ফেলব

প্রফেসর বিল ইয়ং না শোনার ভান করলেন। শ্যারন বলল, তুমি যে কী বাজে কথা বলতে পার জন! ইস!

তারিক খেতে খেতে বিষম খেয়ে বলল, তোমার একেবারে মাথা খারাপ জন! একেবারে মাথা খারাপ!

৬

ফরিদের ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। সস্তা টেলিফোন, তাই বাজে রকমের একটা শব্দ হয়, ফরিদ ধড়মড় করে উঠে বসে। ঘড়িতে সাতটাও বাজে নি, এত সকালে কে ফোন করেছে? হয় জরুরি কোনো কাজ, না হয় নিউ ইয়র্কের কোনো গরু, যে জানে না লস এঞ্জেলসের সময় তিন ঘণ্টা পিছনে। নিউ ইয়র্কে যখন দশটা বাজে, তখন এখানে সকাল সাতটা। ফরিদ টেলিফোনটা হাতে নিয়ে যতদূর সম্ভব গলাটা স্বাভাবিক করে বলল, হ্যালো।

ফরিদ ভাই, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম?

কেউ যদি আসলেই ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম—তখন তার উত্তরে কী বলতে হয়? হ্যাঁ, ভাঙিয়ে দিয়েছ, এখন ভাগো?

ফরিদ যতদূর সম্ভব গলার বিরক্তিটা গোপন করে বলল, না, এই আর কি! আপনি কে কথা বলছেন?

আমি আশরাফ।

ও আচ্ছা, আশরাফ। কি খবর?

খবর বেশি ভালো না।

ফরিদ ভদ্রতা করে গলায় খানিকটা উৎকণ্ঠা ফোটানোর চেষ্টা করে বলল, কেন, কী হয়েছে?

টুকুকে মনে আছে?

টুকু?

হ্যাঁ, হান্নান সাহেবের শালা।

না, মানে—

মনে নেই, হান্নান সাহেবের বাসায় সেদিন ডিনারের সময় ডালের বাটি উল্টে ফেলে দিল?

ফরিদের ভাসা ভাসা মনে পড়ল, খাবার টেবিলে সেদিন সত্যি ডালের বাটি উল্টে গিয়েছিল। কে উল্টেছিল সেটা খেয়াল করে নি। আশরাফকে সেটা বলে লাভ নেই, অন্য আরেকটা ঘটনা মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। ফরিদ চেনার ভান করে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কী হয়েছে টুকুর?

সিকিউরিটি ধরেছে।

কিসের সিকিউরিটি?

সেফওয়েরর। সেফওয়েতে কাজ করত।

কেন ধরেছে?

আশরাফ একটু আমতা-আমতা করে বলল, ইয়ে, বলছে সে নাকি ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা সরিয়েছে।

সত্যি?

সত্যি মিথ্যা তো জানি না ফরিদ ভাই। যেটা শুনেছি সেটা বললাম। আশরাফ গলায় একটা সমবেদনার সুর ফুটিয়ে বলল, সেদিন মাত্র দেশ থেকে এসেছে, এসেই কি রকম একটা ঝামেলায় পড়ল বলেন দেখি!

ফরিদের ঘুম পুরোপুরি চটে গেল এবারে। প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলল, ঝামেলায় পড়ল মানে? চুরি করার সময় মনে ছিল না? দেশ থেকে সব চোর-ছ্যাঁচড় এসে হাজির হয়েছে মনে হচ্ছে!

না না ফরিদ ভাই, কী বলছেন আপনি? সেফওয়ে পুরো কন্ট্রোল করে ইহুদিরা। মুসলমানদের দুই চোখে দেখতে পারে না। ইচ্ছে করে ঝামেলায় ফেলে দেয়—

ফরিদ মহা খাপ্পা হয়ে বলল, ঐ সব জামাতী ইসলাম মার্কা গল্প আমার কাছে করো না। চুরি করার সময় মনে থাকে না, এখন দোষ ইহুদিদের?

আশরাফ দুর্বলভাবে একটু চেষ্টা করে। কিন্তু হাজার হলেও দেশের একটা ছেলে, এইভাবে সিকিউরিটি ধরে আটকে রেখেছে—

চুরি করলে ধরবে না কি মাথায় নিয়ে নাচবে?

কিন্তু ফরিদ ভাই, কিছু-একটা করা দরকার না? হাজার হলেও দেশের ছেলে!

কী করতে চাও?

কোনোভাবে যদি ছুটিয়ে আনা যায়।

আন।

কিন্তু—

কিন্তুটা কি?

আপনি যদি একটু সাহায্য করেন।

আমি? আমি কী করব?

একজন লোক দরকার, যে একটু ভালো কথাবার্তা বলতে পারে। শিক্ষিত মানুষ।

আমি ভালো কথাবার্তা বলতে পারি না। আমার থেকে অনেক বড় শিক্ষিত মানুষ আছে এদেশে।

থাকলেই তো হয় না—আশরাফ এবারে হাটুকুরিয়া শুরু করে, তারা তো বলেন মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আমাদের সাথে কথাবার্তা বলে সেরকম মানুষ আর কয়জন আছে?

কথাটি পুরোপুরি মিথ্যে নয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত বাঙালিরা মোটামুটিভাবে নিজেদেরকে নিজেদের মাঝে গুটিয়ে রাখেন। সাধারণ ঘেটো যাওয়া মানুষজনের সাথে তাদের বিশেষ যোগাযোগ নেই। বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে, আপনি তুমি বাচিয়ে 'আজকাল কী করা হয়' এই ধরনের কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেন। ফরিদ প্রতিষ্ঠিত বাঙালিদের মাঝে পড়ে না, কিন্তু ডক্টরেট করছে বলে শিক্ষিত অপবাদটি প্রায়ই শুনতে হয়। আশরাফ মধ্য লস এঞ্জেলসের একটি কুখ্যাত এলাকায় সেভেন ইলেভেন নামে মনোহারী দোকানে সময়ে অসময়ে কাজ করে। নানা কারণে ফরিদের সাথে তার খানিকটা যোগাযোগ আছে।

আশরাফ বলল, ফরিদ ভাই, কী বলেন আপনি?

ফরিদ বলল, আমি ওসবের মাঝে নেই। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর।

ফরিদ ভাই, টুকুর কথা ছেড়ে দিলাম, হান্নান সাহেবের কথাটা ভেবে দেখেন। জানাজানি হলে কী হবে। রাজাকারের গুষ্টি যদি খবর পায়—

পাক। ফরিদ টেলিফোন রেখে দিল। টুকু নামক চরিত্রটির ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা বরিয়ে জেলে যাবার মানবিক দিকটি ছাড়াও একটি রাজনৈতিক দিকও আছে বলে মনে হচ্ছে। স্থানীয় বাঙালিদের মাঝে নানারকম দলাদলি আছে, আপাতত যে-দু'টি দল সবচেয়ে সক্রিয়, তারা একে অন্যকে যথাক্রমে রাজাকারের গুষ্টি এবং ইন্ডিয়ার দালাল বলে দাবি করে থাকে। আশরাফের কথা শুনে মনে হল টুকুর ভবিষ্যতের সাথে এই দলগুলির ভবিষ্যৎ কোনোভাবে খানিকটা জড়িত হয়ে আছে।

টেলিফোনটা রেখে ফরিদ খানিকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় বসে থাকে। আশরাফ হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে করিৎকর্মা মানুষগুলির একজন। পড়াশোনা বিশেষ নেই। জার্মানি হয়ে কীভাবে কীভাবে এদেশে চলে এসেছে সেটাও খানিকটা রহস্যের মতো। কাজ

করার অসম্ভব ক্ষমতা এবং মনে হয় ভালো দূরদৃষ্টি আছে। টুকু নামক চরিত্রটিকে ছুটিয়ে আনতে যাওয়ার জন্যে নিজে চলে না গিয়ে লেখাপড়া জানা একজন চকচকে মানুষকে নিয়ে যাবার কথাটি যে সে ভেবেছে, সেটাই তার একটা প্রমাণ।

টুকু নামক চরিত্রটির জন্যে ফরিদের কোনো সহানুভূতি নেই, কিন্তু আশরাফকে সে বেশ পছন্দই করে। তাকে এভাবে নিরাশ করতে একটু খারাপ লাগে। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সে আশরাফকে আবার টেলিফোন করল। আশা করছিল সে বের হয়ে যাবে বলে তাকে বাসায় পাবে না, কিন্তু আশরাফকে বাসাতেই পাওয়া গেল। ফরিদ বলল, আশরাফ, আমি ফরিদ।

ফরিদ ভাই, কি ব্যাপার?

টুকুকে ধরে রেখেছে জায়গাটা কোথায়?

আপনি যাবেন ফরিদ ভাই? যাবেন?

তুমি এরকম করে বলছ, ভাই। ঐ চোর-ছ্যাঁচড়ের জন্যে আমার কোনো মায়াদয়া নেই।

আমি জানতাম আপনি যাবেন। আগে একটু রাগ হয়ে চেঁচামেচি করে তারপর রাজি হবেন। হাঃ হাঃ হাঃ। সেই জন্যে টেলিফোনের কাছে বসে আছি।

এখন বল কোথায় যেতে হবে।

আপনি চিনবেন না। আমি যেখানে কাজ করি তার কাছে। আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

একেবারে উল্টো দিকে আসতে হবে তোমার। আমাকে বলে দাও, আমি চলে আসব।

কষ্ট হবে আপনার।

কষ্ট না আশরাফ, এটার নাম যন্ত্রণা।

হাঃ হাঃ হাঃ—আশরাফ হাসতে হাসতে বলে, আপনি যে কী মজার কথা বলেন! এইটা হচ্ছে যন্ত্রণা!

টুকুর কি কাগজপত্র ঠিক আছে?

ইয়ে— মানে—কাগজপত্র তো বুঝতেই পারেন! ক্রোরিডার কেস আর কি।

তার মানে, নেই?

হয়ে যাবে বলেছে লয়ার। খুব ভালো একটা মেক্সিকোর লয়ার আছে।

এখন তো নেই?

না।

ফরিদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, বল কোথায় যেতে হবে।

আশরাফ ফরিদকে জায়গাটা চিনিয়ে দিল। মধ্য লস এঞ্জেলসের মোটামুটি ভদ্র এলাকায় একটা বড় সুপার মার্কেট। সামনে বড় পার্কিং লট, আশরাফ সেখানে

ফরিদের জন্যে অপেক্ষা করবে। ফোন রেখে দেয়ার আগে বলল, ফরিদ ভাই, আরেকটা কথা।

কি কথা?

টুকু যে–টাকা সরিয়েছে, বলেছে সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। বুঝতেই পারছেন অনেকগুলি টাকা।

তা হলে?

টাকাটা তোলার চেষ্টা করছি।

তুমি কেন তোলার চেষ্টা করছ? হান্নান সাহেবের শালা, হান্নান সাহেবকে বল।

হান্নান সাহেব মানে, ইয়ে— টুকুর সাথে একটু গোলমালের মতো। তাই— আশরাফ আমতা–আমতা করে থেমে গেল।

যার শালা তার গরজ নেই, আর তুমি তোমার জান দিয়ে দিচ্ছ?

হাজার হলেও একটা দেশের ছেলে। টাকাটা প্রায় উঠে গেছে। আর একটু হলেই হয়ে যায়। আপনি যদি কিছু দেন।

ফরিদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কত?

কুড়ি ডলার।

কুড়ি ডলার! ফরিদের মেজাজটা আবার খারাপ হয়ে গেল। শুধু যে একটি সকাল মাটি হল তাই নয়, সাথে কুড়িটি ডলার। কুড়ি ডলার তার জন্যে অনেক টাকা। পুরো মাসের পেট্রল খরচ হয়ে যায় গাড়ির।

পার্কিং লটে দু'টি গাড়িতে তিন জন বসে আছে। বাঙালিরা বিদেশে এলে সম্ভবত তুলনামূলকভাবে বেশি গোঁফ রাখে। দেখা যাচ্ছে এখানে যারা এসেছে তাদের সবারই নাকের নিচে অল্পবিস্তর গোঁফ। ফরিদ এদের মাঝে শুধু আশরাফকে চেনে, অন্যদের আগে কখনো দেখে নি।

ফরিদকে দেখে আশরাফ এগিয়ে এল। অন্য দু' জন গাড়িতে বসে বসে কেমন জানি সন্দেহের চোখে ফরিদকে লক্ষ করতে থাকে। আশরাফ বলল, ফরিদ ভাই, এসেছেন? অসুবিধা হয় নি তো কিছু?

না।

আশরাফ অন্য দু' জনের সাথে ফরিদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো চেষ্টা করল না। সামাজিকতার এইসব ছোটখাটো জিনিস আশরাফ বা আশরাফের মতো মানুষজন এখনো পুরোপুরি শেখে নি। আশরাফ গলা নামিয়ে বলল, টাকাটা মোটামুটি জোগাড় হয়েছে।

এটি ফরিদকে তার টাকাটা দেয়ার কথা মনে করিয়ে দেবার একটা ইঙ্গিত। ফরিদ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা বিশ ডলারের নোট বের করে দেয়। ফরিদ মুখ কাঁচুমাচু করে। নোটটি হাতে নিয়ে পকেট থেকে নোটের একটা বান্ডিল

বের করে সেখানে রেখে দিয়ে বলে, আপনার উপর কত রকম অত্যাচার।

সত্যি সত্যি অত্যাচার করে কেউ যদি বলে 'আপনার উপর কত রকম অত্যাচার', তা হলে কী বলা যায়? ফরিদ কিছু বলল না।

আশরাফ বলল, চলেন ভিতরে যাই।

চল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, টুকুর ভালো নামটা কি?

সৈয়দএমদাদউদ্দিন।

সৈয়দএমদাদউদ্দিন?

জ্বি।

ভিতরে গিয়ে কী বলব?

সেটা আপনার বিবেচনা।

ফরিদের বিবেচনার উপর এর আগে কেউ এত বড় আস্থা প্রকাশ করেছে বলে তার মনে পড়ল না।

সেফওয়েটি চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে। এখনো বেলা হয় নি বলে লোকজনের ভিড় বলতে গেলে নেই। গোটা দশেক চেক আউট কাউন্টারের মাঝে মাত্র দু'টি খোলা। সেফওয়ের কিছু মানুষ দিনের প্রস্তুতি হিসেবে বড় বড় ব্যাগ খুলে শেলফে শেলফে জিনিস রাখা শুরু করেছে। ফরিদ কাকে কি জিজ্ঞেস করবে ঠিক বুঝতে পারল না। বড় একটা কার্ট নিয়ে একজন এগিয়ে যাচ্ছিল, ফরিদ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সিকিউরিটির লোকটি কোথায়? তার সাথে একটু কথা বলতে পারি?

লোকটি তাদের দিকে না তাকিয়েই গলা উঁচিয়ে কাউন্টারের মেয়েটিকে ডেকে বলল, লিসা, মার্ককে একটু ডেকে দাও তো।

লিসা নামে কালো, মোটা এবং নির্জীব একটা মেয়ে খুব ধীরে ধীরে ফোনটা তুলে পেজিং সিস্টেমে বলল, মার্ক কাউন্টার নাম্বার সাত। মার্ক কাউন্টার নাম্বার সাত।

প্রায় সাথে সাথেই সেফওয়ের ঘরের কোণা থেকে সোনালি চুলের একজন মানুষকে হনহন করে হেঁটে আসতে দেখা গেল। পুরুষমানুষের সোনালি চুল হলে তাকে কেমন জানি উদ্ধত এবং নিষ্ঠুর মনে হয়, এই লোকটির চেহারাতেও কেমন জানি একটা আলগা কাঠিন্য রয়েছে; এর সাথে নিজের দেশের একজন চোরের পক্ষ হয়ে কথাবার্তা বলতে হবে ভেবে ফরিদ কেমন জানি বিপন্ন অনুভব করে।

সোনালি চুলের মানুষটি, যার নাম মার্ক, ফরিদ এবং আশরাফকে দেখে বুঝে গেল তারা কেন এসেছে। ভদ্রতার কোনোরকম চেষ্টা না করে সোজাসুজি বলে বসল, তোমরা ক্যাশ রেজিস্টারের টাকা–চোরের জন্যে এসেছ?

ফরিদের মাথার মাঝে ক্রোধের একটা ছোট বিস্ফোরণ হল সাথে সাথে, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে ফরিদ, আশরাফ অনেক আশা করে তাকে ধরে এনেছে, রাগ করার সময় এটা নয়। মার্কের চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, অপরাধ

প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নির্দোষ। অপরাধ প্রমাণ হয় কোর্টে, এই ব্যাপারটা এখনো কোর্টে যায় নি।

সোনালি চুলের মানুষটি থতমত খেয়ে গেল, ঠিক এরকম বইয়ের ভাষায় একটি উত্তর সে মোটেও আশা করে নি। ফরিদ এবারে নিজের হাত এগিয়ে দিয়ে বলে, আমার নাম ডক্টর ফরিদ। কথাটি সত্যি নয়, সে পিএইচ. ডি. করছে, এখনো শেষ হয় নি— কিন্তু এখানে এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।

সিকিউরিটির মানুষটি খুব অনিচ্ছার সাথে হাত মিলিয়ে বলল, আমার নাম মার্ক ঝিঝিন্সকি।

ফরিদ আশরাফকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, মিঃ ঝিঝিন্সকি, তোমার সাথে কি আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি?

হ্যাঁ।

কোথায় কথা বলব?

মার্ক আবার অনিচ্ছার সাথে বলল, এস আমার সাথে।

সুপার মার্কেটের এক কোণায় ছোট একটা ঘর, সেখানে কোনোমতে একটা টেবিল পেতে রাখা হয়েছে। দুই পাশে কিছু লোহার ফোল্ডিং চেয়ার। ফরিদ এবং আশরাফ দু'টি চেয়ার টেনে বসে। মার্ক তাদের সামনে বসে মুখ শক্ত করে বলল, তোমাদের কেমন করে সাহায্য করতে পারি?

আমি যতদূর জানি, মিস্টার সৈয়দ এমদাদউদ্দিন গত রাতে সেফওয়ে থেকে বাসায় ফিরে যায় নি। আমি জানতে চাইছিলাম সে কোথায় আছে, কেমন আছে।

সেইদিন ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা সরিয়েছে—

ফরিদ বাধা দিয়ে বলল, আমি সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই না। সৈয়দ এমদাদউদ্দিন আসলেই ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা সরিয়েছিল কি না সেটা বের করার জন্য পুলিশ আছে, কোর্ট আছে। আমি জানতে চাইছি সে কোথায়—

এখানে আছে।

এখানে কোথায়?

পাশে একটা ঘরে।

ফরিদ অবাক হওয়ার ভান করে বলল, ঘরে আটকে রেখেছ?

হ্যাঁ।

তাকে— তাকে কোনোরকম অত্যাচার করা হয় নি তো?

অত্যাচার! অত্যাচার কেন করব?

না, মানে কিছুদিন আগে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল কিনা, তাই। মনে নেই— সাউথ সেন্ট্রালের একটা কে-মার্টে আমাদের একজনকে মেরে ফেলল? সে নাকি কে-মার্টের জিনিস সরিয়েছিল, খুব অত্যাচার করে মেরেছে। শরীরে সিগারেটের পোড়া

দাগ পাওয়া গিয়েছিল, ইলেকট্রিক শক। এ ধরনের নানারকম অত্যাচার। মনে নেই?

মার্ক ঝিঝিন্সকি মাথা নাড়ল, তার মনে নেই। মনে থাকার কথা নয়, কারণ ব্যাপারটি কখনো ঘটে নি।

ফরিদ গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, খুব হৈচৈ হল ব্যাপারটা নিয়ে। আমাদের কমিউনিটি খুব হৈচৈ করেছিল। তুমি তো জান আমাদের কমিউনিটি বিশাল কমিউনিটি।

মার্ক ভুরু কুঁচকে ফরিদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফরিদ আবার বলে, শুধু যে বিশাল কমিউনিটি তাই নয়, আমাদের এই ইন্ডিয়ান কমিউনিটি অত্যন্ত একতাবদ্ধ কমিউনিটি।

ফরিদ একসাথে দু'টি মিথ্যে কথা বলল। প্রথমত সে ভারতবর্ষের মানুষ নয়, সে বাংলাদেশের। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের সম্প্রদায় মোটেও একতাবদ্ধ নয়, তাদের ভিতরকার দলাদলি আজকাল শিল্প পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। নিজেকে ভারতবর্ষের মানুষ হিসেবে দাবি করার অবশ্যি অন্য কারণও আছে, এতে টাকা চুরির অপরাধটি একজন ভারতীয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হল। তা ছাড়া বাংলাদেশ এদের কাছে মোটামুটি একটি অপরিচিত দেশ। সে তুলনায় ভারতবর্ষকে চট করে চিনে নেয়। নিজেদের এখন ভারতবর্ষের বলে পরিচয় দিয়ে একতাবদ্ধ হিসেবে দাবি করলে বেশ জোর দিয়ে কথা বলা যায়।

মার্ক মানুষটি মনে হচ্ছে একটু ঢিলেঢালা গোছের, শক্ত মুখ করে বসে রইল। ফরিদ আবার বলল, কে-মার্টের সেই দুর্ঘটনার পর থেকে আমরা খুব সচেতন। এ ধরনের ব্যাপার আমরা আর সহ্য করব না। আমেরিকা যেরকম তোমার দেশ, সেরকম আমাদেরও দেশ। তোমাদের যেমন অধিকার, আমাদেরও সেরকম অধিকার। তা ছাড়া ভারতীয় সম্প্রদায় এখন একটা শক্তিশালী জনশক্তি। আমরা যে- কংগ্রেসম্যানকে সমর্থন করি, সে চোখ বুজে ইলেকশানে উঠে আসে। আশা করি হঠাৎ করে এমন কিছু করা হবে না, যেটি এই বিশাল ভারতীয় সম্প্রদায়কে কোনোভাবে বিচলিত করবে।

মার্ক আস্তে আস্তে টেবিলে টোকা দিতে দিতে বাঁকা করে হেসে বলল, সেইদ ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা সরিয়েছে—

সে যদি সত্যি এটা করে থাকে তা হলে তার জন্যে অবশ্যি তাকে শাস্তি পেতে হবে। অবশ্যি অবশ্যি পেতে হবে—ফরিদ টেবিলে একটা থাবা দিয়ে বলল, কিন্তু সেই শাস্তি দেবে এই দেশের আইন। তুমি তো তাকে শাস্তি দিতে পারবে না। তুমি সৈয়দ এমদাদউদ্দিনকে সারা রাত আটকে রেখে তার সাংবিধানিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করেছ। ফরিদ তার মুখে গভীর দুঃখের একটা ভাব ফুটিয়ে মাথা নাড়ে।

মার্ককে এই প্রথম বার একটু বিচলিত হতে দেখা গেল। বলল, কিন্তু সে নিজে স্বীকার করেছে। নিজে বলেছে—

বলুক। তাতে কিছু আসে যায় না। তাকে সাথে সাথে পুলিশের হাতে দেয়া উচিত ছিল। তাকে পুলিশের হাতে না দিয়ে নিজে আটকে রেখে তার সংবিধানিক অধিকার তুমি ক্ষুণ্ণ করেছ। সৈয়দ ব্যক্তিগতভাবে হয়তো একজন চতুর্থ শ্রেণীর অপরাধী, কিন্তু

যতক্ষণ তার অপরাধ প্রমাণিত না হচ্ছে, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। ফরিদ হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে অনেকটা অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা সৈয়দকে নিয়ে কী করবে বলে ঠিক করেছ?

মার্ক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমরা তার কী হও?

আমরা একই সম্প্রদায়ের মানুষ, সে হিসেবে এসেছি।

মার্ক ফরিদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, সেইদ অনেকদিন থেকে টাকা সরাচ্ছে। হিসেব করে দেখা গেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের উপরে। টাকাটা ফেরত দেওয়া হলে ছেড়ে দেব। না হলে প্রসিকিউট করা হবে।

আশরাফ ফিসফিস করে বাংলায় বলল, সাড়ে তিন হাজার? আমি তো শুনেছিলাম সাত শ'।

তোমার কাছে কত আছে?

টেনেটুনে সাড়ে সাত শ'। তখন তো তাই বলল।

ফরিদ মার্কের দিকে তাকিয়ে বলল, সাড়ে তিন হাজার ডলার আমাদের কাছে নেই।

দুই ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, নিয়ে এস।

দুই ঘণ্টা কেন, দুই বছর সময় দিলেও হবে না। আমাদের কমিউনিটি একটা সম্মানজনক কমিউনিটি। আমরা বড় বড় কাজে ফান্ড রেইজিং করেছি। গত বছর এখানকার ডায়াবেটিক সোসাইটিকে আমরা দশ হাজার ডলার তুলে দিয়েছি। চতুর্থ শ্রেণীর একটা অপরাধীর জন্যে তো আমরা ফান্ড রেইজিং করতে পারি না। কেউ এর জন্যে একটি পেনিও দেবে না। আমরা ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করি।

মার্ককে এবারে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, ভুরু কুঁচকে বলল, কী বলছ তাহলে?

আমাদের কাছে এখন পাঁচ শ' ডলার আছে, তোমাদের দিই। তোমরা সৈয়দকে ছেড়ে দাও।

পাঁচ শ' ডলার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

কেন? ক্ষতি কি? কোনো তো প্রমাণ নেই যে সে সত্যি সাড়ে তিন হাজার ডলার সরিয়েছে। আমাদের এত টাকা নেই। পাঁচ শ' ডলার দিই, ছেড়ে দাও। এখনি দিতে পারি—সাথেই আছে।

না।

দেখ, সৈয়দ এই লাইনে নূতন। তাকে ছেড়ে দিলে আমরা হয়তো বুঝিয়ে তাকে ঠিক করে দিতে পারব। যদি প্রসিকিউট কর, আমি লিখে দিতে পারি ঘাঘু ক্রিমিন্যাল হয়ে বের হয়ে আসবে। ছেড়ে দাও।

না।

শেষবার বলছি। পাঁচ শ' ডলার দিই।

মার্ক জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, কিছুতেই না। সাড়ে তিন হাজার ডলারের

এক পেনিও কম নয়।

ফরিদ তখন উঠে দাঁড়াল। গলার স্বরে খানিকটা হতাশা ফুটিয়ে বলল, ঠিক আছে তা হলে, তোমার যা ইচ্ছা।

আশরাফ ফরিদের হাত খামচে ধরে বলল, ফরিদ ভাই—

ফরিদ হাত সরিয়ে বাংলায় বলল, দাঁড়াও তুমি। তারপর মার্কের দিকে ঘুরে বলল, আমি কি সৈয়দের সাথে একটু দেখা করতে পারি?

কেন?

দেখতে চাই তাকে শারীরিকভাবে কোনো যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে কি না। তোমরা যদি ব্যাপারটা কোর্টেই নিষ্পত্তি করতে চাও, তার একটা সাক্ষী থাকা ভালো। টর্চার করেছ কি না—

মার্ক ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, টর্চার?

হ্যাঁ। কে-মার্টের মার্ডার কেসে দেখা গিয়েছে সারা রাত টর্চার করেছিল। সিগারেটের ছ্যাঁকা থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক শক। ভয়াবহ ব্যাপার!

এখানে কোনো টর্চার হয় নি।

সেটা তোমার মুখের কথা। আমি সৈয়দের মুখের কথাও শুনতে চাই। কে সত্যি কথা বলছে সেটা কোর্ট যাচাই করবে।

মার্কের মুখে একটা ক্রোধের ছায়া পড়তে থাকে। ফরিদ গম্ভীর গলায় বলল, একজন মানুষকে সারা রাত খেতে না দিয়ে আটকে রাখাও এক ধরনের টর্চার। রাতে খেতে দিয়েছ কিছু?

সারা রাত এমনিতেই কাজ করার কথা। খাওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন?

তুমি তাই মনে কর। কোর্ট অন্য রকম মনে করতে পারে।

মার্কের মুখ রাগে আস্তে আস্তে লাল হয়ে ওঠে। একদৃষ্টে ফরিদের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমার সাথে নোংরা চাল চালার চেষ্টা করছ?

না, এটা নোংরা চাল না। তুমি তোমার ইন্টারেস্ট রক্ষা করবে, আমি আমার কমিউনিটির মানুষের ইন্টারেস্ট রক্ষা করব। আমার কথা শোন। পাঁচ শ' ডলার দিই, তাকে ছেড়ে দাও। ঝামেলা হবে না।

না। সাড়ে তিন হাজার ডলারের এক পেনি কম নয়।

ঠিক আছে। ফরিদ হঠাৎ মনে পড়েছে সেরকম ভান করে বলল, তুমি তো জান, সৈয়দ বেআইনিভাবে এদেশে আছে। গ্রীন কার্ড নেই। তার কাজ করার কোনো কাগজপত্র নেই।

মার্ক অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ফরিদের দিকে তাকাল। ফরিদ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমার কথা বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিয়ে আস। আমি অপেক্ষা করছি এখানে।

সে তা হলে কেমন করে কাজ করছে এখানে?

আমি জানি না, তুমি বল আমাকে। কেউ নিশ্চয়ই কাগজপত্র না দেখে কাজ দিয়েছে। কোর্টে যখন কেস উঠবে, যদি কোনোভাবে ইমিগ্রেশান খোঁজ পায়, তোমাদের বড় ঝামেলা হয়ে যাবে। তুমি তো এখন সাড়ে তিন হাজার ডলার চাইছ, সেখানে চোখ বুজে দশ হাজার ডলার ফাইন হয়ে যাবে। নাকি আরো বেশি?

মার্ক খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ কেমন জানি ক্ষেপে উঠল। প্রথম কিছুক্ষণ রাগে কোনো কথাই বলতে পারল না। তারপর পা দাপিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলে ঘুষি মেরে বলল, পাঁচ শ' ডলার রেখে এই গুহ্যদ্বারকে নিয়ে এই মুহূর্তে বিদায় হও। এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তে—

ফরিদ শান্ত স্বরে বলল, মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই মিঃ ফিজিপতি। আমাকে একটা রিসিট দিতে হবে।

মার্ক অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ফরিদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

গাড়িতে ফরিদের পাশে টুকু বসে আছে। সেফওয়ে থেকে টুকুকে বের করে আনার পর ফরিদ নিজেই তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কথা বলেছে। আশরাফের কাছে যাবার সময় হয়ে গেছে, অন্য দু' জন টুকুর সাথে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে রাজি নয়। ফরিদের ইচ্ছে ছিল গাড়ি করে নেবার সময় এই চরিত্রটিকে একটি শক্ত শিক্ষা দেয়ার, যেন এই জীবনে দ্বিতীয়বার এ ধরনের কাজ না করে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপারটি এত সহজ নয়। টুকুর প্রায় ছেলেমানুষি চেহারা, একমাথা কোঁকড়া চুল, টকটকে ফর্সা গায়ের রং, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, মায়াকাড়া চেহারা দেখলে কে বলবে সে ক্যাশ রেজিস্টার থেকে নিয়মিত টাকা সরিয়ে আসছে!

শহরের ব্যস্ত রাস্তায় যতক্ষণ ছিল, ফরিদ কোনো কথা বলল না। ফ্রী ওয়েতে উঠে বলল, তুমি কেমন করে এরকম একটা কাজ করলে?

টুকু আহত স্বরে বলল, আপনি তাই ভাবছেন যে আমি ওটা করেছি?

কর নি?

বিশ্বাস করেন আমি করি নি।

তা হলে?

আপনি তো জানেন আমার কাগজপত্র ঠিক নেই। মেক্সিকান একটা লোক আছে, নাম আলবার্তো, আমার কাছ থেকে তিন শ' ডলার নিয়ে আমাকে কাজ দিয়েছে। সেই ব্যাটা ঠিক যখন আমার ডিউটি পড়ে, ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা সরিয়ে ফেলে।

তুমি সরাতে দিলে কেন?

আমি কি এতসব জানি? নূতন এসেছি, কিছু বুঝি না আমি। যখন টের পেয়েছি, ঠিক করেছি কমপ্লেন করব, বদমাইসটা বলে আমাকে চাকরি থেকে বের করে দেবে। বলে দেবে কাগজপত্র নেই। বুঝতেই পারছেন নূতন দেশ থেকে এসেছি, হাতে একটা পয়সা নেই।

এভাবে এলে কেন?

কী করব ফরিদ ভাই? ইন্টারমিডিয়েটের আগে শরীর খারাপ হল, রেজাল্ট একেবারে যা-তা। ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিক্যাল কোথাও চান্স পাই না। আব্বা বললেন, আমেরিকা আসবি নাকি? আমি ভাবলাম আমেরিকা না জানি কী দেশ। এসে কী ঝামেলাতেই না পড়েছি! এই দেশে মানুষ থাকে কেমন করে ভাই?

সবাই তো আছে। অসুবিধে কোথায়? তোমার মতো ঝামেলাতে তো কেউ পড়ছে না। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা শিখতে হবে না?

তাই তো শিখছি ভাই। প্রথম শিক্ষা হল আমার, সেটা হচ্ছে, কোনো মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই। তবে সেটা শেখার জন্যে অনেক মূল্য দিতে হল। কী একটা লজ্জার ব্যাপার হল বলেন দেখি। কেউ যদি শোনে, ভাববে সত্যি আমি টাকা চুরি করেছি। টুকু ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল হঠাৎ, বলল, দেশে মা যদি খবর পায় একেবারে মরে যাবে মা। একেবারে মরে যাবে।

ফরিদ বলল, আরে কাঁদার কী আছে এর জন্যে? তুমি নিজে যদি খাঁটি মানুষ হও কে কি বলল, তাতে কী আসে যায়!

টুকুকে তার বোনের বাসায় নামিয়ে সোজা ইউনিভার্সিটি চলে যাবে ফরিদ, তাই রাস্তায় নিজের অ্যাপার্টমেন্টে থেমে গেল ফরিদ। চা খাবে নাকি জিজ্ঞেস করল টুকুকে, সে খুব আগ্রহ নিয়ে রাজি হল। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল ছেলেটা ক্ষুধার্ত। ফরিদ তাই ফ্রীজ থেকে খাবার বের করে দিল, রাতের রান্না করা। কিমা এবং ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত। একটু গরম করে দিতে চাইছিল ফরিদ, টুকু বলল, কোনো প্রয়োজন নেই, ঠাণ্ডা ভাত জমে থাকা কিমার তরকারি দিয়ে বুভুক্ষুর মতো খেল টুকু। দেখে মনে হল বেচারা কতদিন থেকে না খেয়ে আছে।

এই ফাঁকে ফরিদ চট করে গোসলটা সেরে নিল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে গোসল না করা পর্যন্ত তার নিজেকে কেমন জানি নির্জীবের মতো মনে হয়।

টুকুকে তার বোনের বাসায় নামিয়ে ইউনিভার্সিটি যেতে যেতে বেলা বারটা বেজে গেল ফরিদের।

দুপুরে ক্যাফেটারিয়ায় খেতে গিয়ে ফরিদ আরো একটা জিনিস আবিষ্কার করল—তার মানিব্যাগে একটি পয়সাও নেই। কেউ-একজন যত্ন করে তার মানিব্যাগ থেকে শেষ ডলারটিও সরিয়ে নিয়েছে। সকালে গোসল করার সময় মানিব্যাগটি টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল।

টুকুর সামনে।

৭

ক্লাসরুমের বন্ধ দরজার সামনে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতর থেকে ফাইনাল দুই শ' তিনের লোকজন একে একে বের হয়ে আসছে। সরকার স্যারের এই

ফ্লাইটে আসার কথা। ঠিকমতো প্লেনে উঠেছেন কি না জানার কোনো উপায় নেই। সেই কোন গ্রামের স্কুলের শিক্ষক, কথা নেই বার্তা নেই আমেরিকার লস এঞ্জেলসের মতো শহরে চলে আসছেন— তারিক মনে মনে খুব দুশ্চিন্তা অনুভব করে। সে দীর্ঘদিন থেকে এদেশে আছে, অনেকবার কাজেকর্মে নানা দেশে গিয়েছে, কিন্তু এখানো নূতন দেশে নূতন এয়ারপোর্টে কাস্টমস ইমিগ্রিশানের ভিতর দিয়ে যেতে তার অশান্তির শেষ থাকে না। সরকার স্যার কীভাবে পুরো ব্যাপারটা সামলে নেবেন সে ভেবে পায় না।

এক জন এক জন করে মানুষ অতিকায় স্যুটকেস ঠেলতে ঠেলতে বের হয়ে আসছে। সরকার স্যারের কোনো দেখা নেই। তারিক যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল, ঠিক তখন সরকার স্যার বের হয়ে এলেন। পরনে স্যুট এবং যে-কোনো মানুষ দেখলে বুঝতে পারবে এই মানুষটির স্যুট পরে অভ্যাস নেই। শুধু যে আড়ষ্ট একটা চেহারা তাই নয়, মাথায় একটি টুপি এবং গলায় উজ্জ্বল সবুজ রংয়ের মাফলারে তাঁকে দেখতে খানিকটা পাগল এবং খানিকটা বেশ্যার দালালের মতো দেখাচ্ছে। সরকার স্যার বের হয়ে এসে ভীত চোখে চারদিকে তাকাচ্ছেন, চারদিকে মানুষের ভিড়। কোথায় কোনদিকে যাবেন বুঝতে পারছেন না। চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্ক, ঘন ঘন ঢোক গিলছেন, দেখে মনে হয় কেঁদে ফেলবেন যে-কোনো মুহূর্তে।

তারিক প্রায় দৌড়ে গিয়ে ডাকল, সরকার স্যার!

সরকার স্যার যেন অকূলে কূল পেলেন, জাপটে তারিকের হাত ধরে ফেললেন, বললেন, বাবা তারিক, এসেছিস তুই, এসেছিস!

এরকম সময়ে স্কুলের স্যারদের পা ছুঁয়ে সালাম করলে তাঁরা খুব খুশি হন, কিন্তু তারিক তার চেষ্টা করল না। ভয়ংকর ভিড় এখানে, নিচু হয়ে বসলে মানুষের ধাক্কায় ছিটকে পড়বে কোথাও। জিজ্ঞেস করল, পথে কোনো অসুবিধে হয় নি তো স্যার?

হয় নি আবার! কী বলিস তুই? আরেকটু হলে লাইবেরিয়া না সাইবেরিয়া চলে যেতাম। ওহ্ খোদা! কী বাঁচাটাই না বেঁচেছি! খোদা ভরসা! পৌঁছে তো গেলাম! সরকার স্যার যুদ্ধজয়ের ভঙ্গি করে তারিকের দিকে তাকালেন।

আর কোনো চিন্তা করবেন না স্যার।

না! আর কোনো চিন্তা নাই। সরকার স্যার এবার তারিকের দিকে ভালো করে তাকালেন, বললেন, তোর কী খবর বাবা? শরীরটা ভালো? এই বিদেশে থেকেও শরীরটা এত শুকনা? খালি দেখি কয়টা হাড্ডি।

কী বলেন স্যার! ওজন অন্তত দশ পাউন্ড বেড়েছে। আপনার শরীর কেমন?

এই বয়সে যেরকম থাকে। বেঁচে আছি আল্লাহ্‌র দোয়ায়।

চলেন স্যার যাই।

চল্ বাবা।

তারিক স্যারের স্যুটকেসটা তুলে নিল। স্যার বাধা দিতে গিয়ে থেমে গেলেন, সম্ভবত তাঁর মনে পড়ল, এদেশে মালপত্র নিজেদের টানাটানি করতে হয়।

লস এঞ্জেলস এয়ারপোর্টের রাস্তাঘাট ভালো নয়। সাধারণত সব বড় এয়ারপোর্টেই সরাসরি ফ্রী ওয়ে দিয়ে ঢুকে যাওয়া যায়। এই এয়ারপোর্টে সে ব্যবস্থা নেই। শহরের রাস্তাঘাট দিয়ে বেশ খানিক দূর গিয়ে তারপর ফ্রী ওয়েতে উঠতে হয়। এই এলাকাটি ভালো নয়, খুব কাছেই রয়েছে ইংগলউড শহরতলি। তার আশেপাশে অনেক জায়গায় আদিম জগতের বর্বরতা পুরোদমে রাজত্ব করছে। তারিক তাই ফ্রী ওয়েতে না ওঠা পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করে না, খুব সাবধানে রাস্তাঘাটের সাইন দেখে এগুতে থাকে।

সামনে রাস্তা দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, উপরে লেখা কোন দিকে যেতে হবে। তারিক পড়তে চেষ্টা করছিল, ঠিক তখন সরকার স্যার জিজ্ঞেস করলেন, এই শহরে কত মানুষ থাকে রে?

তারিক সাইনটি পড়তে পারল না। মানুষের মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই একসাথে দু'টি কাজ করতে পারে না। স্যারের প্রশ্নটি মুহূর্তের জন্যে তারিকের মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছিল বলে সাইনবোর্ডটি দেখেও সেখানে কী লেখা আছে পড়তে পারল না, সাইনবোর্ডটি পার হয়ে এল তারিক। স্যার আবার জিজ্ঞেস করলেন, কত লোক থাকে রে?

এই তের-চোদ্দ মিলিওনের মতো।

তারিক আবার চোখ খোলা রাখে, এই এলাকায় রাস্তাঘাট খুব ভালো করে চিহ্নিত করা আছে, সামনে নিশ্চয়ই আবার দেখা যাবে।

সত্যি আবার দেখা গেল, তারিক যে ফ্রী ওয়েটি নেবে সেটি এসে গেছে। যারা উত্তরে যাবে তারা বাম দিকে, যারা দক্ষিণে যাবে তারা ডান দিকে। কোনো-এক অজ্ঞাত কারণে তারিক উত্তর ও দক্ষিণ সব সময়ে গুলিয়ে ফেলে, চোখ বন্ধ করে পুরো এলাকাটি কল্পনা করে তাকে বের করতে হয় সে উত্তরে যাবে না দক্ষিণে যাবে। তারিক যখন ভেবে বের করার চেষ্টা করছিল, সরকার স্যার আবার জিজ্ঞেস করলেন, এক মিলিওন মানে কত রে?

তারিকের সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল, বলল, এক সেকেণ্ড স্যার।

কী হয়েছে?

আমি রাস্তাটা নিয়ে নিই।

নে বাবা, নে।

তারিক আবার ভুল করে ফেলল, যে-রাস্তাটি নেয়ার কথা সেটি নিতে পারল না। গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়ার উপায় নেই, কাজেই সোজা সামনে চলে যেতে হল। বেশ খানিকটা এগিয়ে তারিক গাড়িটা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে ডান দিকে ঢুকে পড়ে। এক ব্লক এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে আবিষ্কার করল রাস্তাটি বাম দিকে বাঁকা হয়ে ঘুরে যাচ্ছে। তারিক ভয় পেয়ে দেখল, রাস্তাটি শহরের সবচেয়ে ভয়ংকর এলাকার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে মানুষ বেশি নেই, গাড়িও খুব কম। দোকানপাট বন্ধ, দেয়ালে হিজিবিজি আঁকা। রাস্তার মোড়ে কিছু ভয়ংকরদর্শন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দেখেই বোঝা যায় এই পৃথিবী থেকে তারা কিছু পায় নি, তাই পৃথিবীর কোনো

কিছুর জন্যে তাদের কোনো ভালবাসা নেই।

তারিক বুঝতে পারে সে খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছে। তাকে যেভাবেই হোক এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে— যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সামনে না গিয়ে এখানেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নিতে হবে। তারিক তাড়াতাড়ি জানালা তুলে দরজা বন্ধ করে দিল, প্রথমে নিজেরটা, তারপর সরকার স্যারেরটা।

ছোট একটা গলি দেখা গেল সামনে। গাড়ির মাথাটা অল্প ঢুকিয়ে মনে হয় ঘুরিয়ে নেয়া যাবে। পিছনে কোনো গাড়ি নেই দেখে নিশ্চিত হয়ে সে সাবধানে গাড়িটার মাথা গলিটিতে অল্প একটু ঢুকিয়েছে, সাথে সাথে প্রচণ্ড চিৎকার করে কে যেন গাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে হ্যাঁচকা টান মেরে গাড়ির দরজা খুলতে চেষ্টা করে, না পেরে গাড়ির বনেটের উপর শুয়ে পড়ে গাড়ির কাঁচে আঘাত করতে থাকে। লোকটি বিশাল, গায়ের রং কালো এবং হাতে একটি বোতল। প্রচণ্ড চিৎকার করে সে হাতের বোতলটি দিয়ে গাড়ির কাঁচ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে। তারিক গিয়ার পাল্টে গাড়িটাকে পিছিয়ে এনে লোকটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। লোকটি চিনে জোঁকের মতো ঝুলে থাকে গাড়িতে, গাড়িটা ঘুরছে বলে বোতল দিয়ে ঠিক করে আঘাত করতে পারছে না। তারিক গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দেয়, দশ থেকে কুড়ি, কুড়ি থেকে ত্রিশ, তারপর হঠাৎ প্রাণপণে ব্রেক কষে। সাথে সাথে লোকটি গাড়ির বনেট থেকে গুলির মতো ছুটে বের হয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়ে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী তাই হওয়ার কথা।

প্রচণ্ড জোরে পড়েছে নিশ্চয়ই, লোকটি উঠতে পারছে না রাস্তা থেকে। পকেটে হাত দিচ্ছে, পিস্তল রিভলবার কিছু বের করবে নাকি? তারিক পাশ কাটিয়ে বের হয়ে গেল দ্রুত, পিছন থেকে কিছু চিৎকার হৈচৈ হল, এমনকি মনে হল গুলির শব্দও হল কয়েকটা। বড় রাস্তায় এসে তারিক প্রথম বার সহজভাবে নিঃশ্বাস নিল, সামনে দেখা যাচ্ছে সান্তামোনিকা ফ্রী ওয়ে, সে উত্তরে যাবে, ডান দিকের রাস্তায়। আর যেন কোনো ভুল না হয়। ফ্রী ওয়েতে উঠে বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, খুব বেঁচে গেলাম আজ।

সরকার স্যার হতভম্ব হয়ে বসে ছিলেন। প্রথম বার কথা বললেন এবারে, জিজ্ঞেস করলেন, তারিক বাবা, লোকটা কি ক্ষ্যাপা ছিল?

ক্ষ্যাপা না, ডাকাত। মাগিং করতে এসেছিল।

মাগিং? সেটা মানে কি?

হাইজ্যাকিং— ডাকাতি বলতে পারেন। গাড়ির কাঁচটা শক্ত ছিল বলে বেঁচে গেলাম। না হলে কী যে হত আজকে, উহ্‌!

সরকার স্যার দুর্বল গলায় বললেন, কিন্তু আমি যে শুনেছি বিদেশের মানুষ অনেক ভালো, ঘরের দরজা খুলে রাখে, তবু কেউ ভিতরে ঢোকে না।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষ একরকম স্যার। সব দেশে ভালো মানুষ আছে। সব দেশে চোর-বদমাইস আছে।

নিগ্রোগুলি খুব বদমাইস হয়, তাই না?

না না স্যার, এটা ঠিক না। এরা গরিব বলে চুরি-ডাকাতি এদের মাঝে বেশি। কিন্তু মানুষ তো একই। আলাদা করে খারাপ হবে কেমন করে? তা ছাড়া এদেরকে নিগ্রো বলতে হয় না।

কি বলতে হয়?

কালো।

কালো? শুনলে রাগ হবে না?

না।

তাজ্জবের ব্যাপার! সারা জীবন শুনে এসেছি কানাকে কানা বলিবে না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিবে না—

কানা খোঁড়া আর কালো তো এক জিনিস হল না। কানা খোঁড়া হচ্ছে এক ধরনের অক্ষমতা, কালো তো আর অক্ষমতা না। কালো হচ্ছে একটা রং। এদেশে কালোদের অবস্থা খুব খারাপ, কিন্তু সেটা তো অন্য ব্যাপার। ক্রীতদাস ছিল সবাই একসময়, বুঝতেইপারেন—

স্যার অনেকটা আপন মনে বললেন, কিন্তু আমি শুনেছিলাম এদেশের সব কিছু ভালো। সব কিছু ভালো।

ভুল শুনেছিলেন।

স্যার রাস্তায় বেশি কথা বললেন না। ইংলন্ডের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা স্যারকে খুব দমিয়ে দিয়েছে, প্রথম দিন এসেই এরকম একটা অভিজ্ঞতা হওয়ার পর খুব মনমরা হয়ে গেছেন। লস এঞ্জেলসের ফ্রী ওয়েতে ছয়টি পাশাপাশি লেন, অসংখ্য গাড়ি, ডাউনটাউনের উঁচু উঁচু দালান, ঝকঝকে আলোকোজ্জ্বল শহর— কোনো কিছু দেখেই স্যার আর কিছু বললেন না। অ্যাপার্টমেন্টে এসে স্যার বেশ খানিকক্ষণ পর একটু সহজ হলেন। তারিক ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে গিয়েছিল, সবকিছু ঘুরেফিরে দেখলেন। বাথরুমে গিয়ে বললেন, শরীরটা কড়া হয়ে গেছে। একটা গোসল দিতে পারলে হত।

গোসল করেন।

এখন! এই রাত্রিবেলা? বুকে ঠাণ্ডা লেগে যাবে বাবা। বুড়ো হয়ে গেছি।

দিনে গোসল করলে যদি ঠাণ্ডা না লাগে, তা হলে রাতে গোসল করলে কেন ঠাণ্ডা লাগবে? আর আপনার হিসেবে এখন তো দিনই। এখানে যখন রাত, বাংলাদেশে তখন দিন না?

হেঃ হেঃ হেঃ, তা কথা ঠিকই বলেছিস। কিন্তু ঠাণ্ডা পানি দিয়ে—

ঠাণ্ডা পানি দিয়ে কেন গোসল করবেন?

তুই এখন আবার পানি জ্বাল দিয়ে গরম করে দিবি?

আমি কেন গরম করে দেব? ট্যাপ খুললেই তো গরম পানি।

শুনে সরকার স্যার চমৎকৃত হয়ে গেলেন। তারিক পানির ট্যাপ খুলে সরকার

স্যারকে দেখাল। স্যার অবাক হয়ে পানির উষ্ণতা পরীক্ষা করতে করতে বললেন, গ্রামদেশে একটা কথা আছে, গ্রাম্য কথা, মূর্খ অশিক্ষিত কথা, পেটে গু থাকলে জিলিপি বানিয়ে ইয়ে করা যায়— এই আমেরিকার মানুষের পেটে গু আছে!

সরকার স্যার সময় নিয়ে গোসল করে একটা লুঙ্গি পরে বের হলেন। তাঁকে দেখে বেশ সজীব দেখাতে লাগল, ছোট একটা চিরুনি দিয়ে পাওলা হয়ে যাওয়া চুল সমান করতে করতে বললেন, জায়নামাজটা দে দেখি, নামাজটা পড়ে ফেলি।

তারিকের কোনো জায়নামাজ নেই, কখনো ছিলও না। মাথা চুলকে বলল, একটা পরিষ্কার টাওয়েল দিলে হবে না স্যার?

হবে। পশ্চিম কোন দিকে?

তারিক দেখিয়ে দিতে গিয়ে থেমে গেল, তার মনে পড়ল এখানে নামাজ পশ্চিম দিকে মুখ করে পড়ে না। বলল, স্যার, আপনাকে তো পূর্ব দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে।

পূর্ব দিকে?

হ্যাঁ, মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার কথা। এখান থেকে মক্কা হচ্ছে পূর্ব দিকে। একটু দক্ষিণ ঘেঁষে।

সরকার স্যারের খানিকক্ষণ লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। যখন বুঝলেন, তখন তিনি একেবারে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন। মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, কী ত্রিলিসমাতি ব্যাপার! দুনিয়ার উল্টা দিকে চলে এসেছি!

সরকার স্যার নামাজ পড়তে শুরু করলেন। সুর করে সূরা পড়ছেন, বেশ লাগে শুনতে, বেন ভানি ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। তারিক এই ফাঁকে টেলিফোন করে পুলিশকে সন্ধেবেলার ব্যাপারটি জানিয়ে রাখল। পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা গা করল বলে মনে হল না। মনে হয় এ ধরনের ব্যাপার প্রায় রোজই ঘটছে, তবু পুলিশের লোকটি তারিককে খুশি করার জন্যে তার নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার টুকে রাখল।

খেতে বসে রান্নার আয়োজন দেখে স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, তুই রেঁধেছিস সবকিছু?

না হলে কে রাঁধবে স্যার? আমার কি আর বাবুর্চি আছে?

স্যার মুরগির গোশত প্লেটে নিয়ে বললেন, একী! এই মুরগি তো দেখি হাতির সাইজ!

জ্বি স্যার। হরমোন দিয়ে বড় করে রাখে। যারা খায় তারাও নাকি ধীরে ধীরে হাতির সাইজ হয়।

স্যার হা-হা করে হেসে বললেন, তাহলে খা, তুই খা বেশি করে।

তারিক স্যারের সঙ্গে খেতে বসে। একটু ভয়ে ভয়ে ছিল, পাছে স্যার জিজ্ঞেস করে বসেন এটা হালাল মুরগি কি না। সে সুপার মার্কেটের মুরগি কিনে আনে, হালাল

মুরগি খাওয়ার মতো রুচি বা ধর্মপ্রীতি কোনোটাই তার নেই।

সরকার স্যার মনে হল খুব তৃপ্তি করে খেলেন। তবে স্যারের খাওয়ার ভঙ্গিটি ভালো না, একটা গ্রাম্য ভাব আছে। ভাতের বড় লোকমা তৈরি করে মুখে দিয়ে শব্দ করে তিতরে টেনে নেন, একটু পরপর আঙুলগুলি মুখে পুরে চেটে পরিষ্কার করে নেন। খাওয়ার শেষের দিকে শব্দ করে একটা ঢেকুর তুললেন এবং প্লেটে পানি ঢেলে হাত ধুয়ে ফেললেন।

খাবার টেবিলে বসে সরকার স্যারের সাথে তারিকের গণমুক্তি নিয়ে কথা হল। গ্রামের ছেলেদের পড়াশোনার নানারকম অসুবিধে। এত কষ্ট করে যেসব জিনিস শেখে, তার বেশির ভাগই নাকি বিশেষ কাজে আসে না। তা ছাড়া সবার পড়ার সময় নেই, উৎসাহ নেই। স্যার তাই গ্রামের ছেলেদের উপযোগী করে একটা সিলেবাস তৈরি করেছেন, সেখানে যার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু পড়ে, যার উৎসাহ বেশি সে এখানে পড়া শেষ করে নিয়মিত স্কুলে যায়। সেই স্কুলের সময় দশটা-পাঁচটা নয়, যার যখন সময় হয় তখন। একজন সেখানে অন্যজনকে শেখায়। সেই স্কুলে পাঁচ বছরের বাচ্চাও আছে, আবার ষাট বছরের বুড়োও আছে। পৌরনীতি, সমাজনীতি শেখানোর আগে সেই স্কুলে প্রথমে শেখানো হয় স্বাস্থ্যবিধি। তারপর চাষপ্রণালী। গতবার বন্যার পর নাকি স্যারের গ্রামের একটি মানুষও ডাইরিয়ায় মারা যায় নি, ধানের ফলন নাকি অন্য দশ গ্রাম থেকে বেশি।

গ্রামের এইসব নানারকম কার্যকলাপের নাম দিয়েছেন গণমুক্তি। তার কথা বলতে বলতে স্যারের চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করতে থাকে— মনে হয় বয়স কুড়ি বৎসর কমে গেছে।

গণমুক্তির কথা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন কোনো-এক এন. জি. ও.-র কর্মকর্তা স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছিল, কীভাবে গণমুক্তির কাজকর্ম করা হয় দেখে গিয়েছিল। কিছু কিছু জিনিস তাদের খুব ভালো লেগেছে, আবার কিছু কিছু জিনিস তারা একেবারে পছন্দ করে নি। স্যারকে বলেছিল, যদি তিনি তাদের পরিকল্পনামাফিক কাজকর্ম করেন, তা হলে তারা টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করবে। স্যার রাজি হন নি, গণমুক্তির প্রথম উদ্দেশ্যই হচ্ছে কারো কোনো সাহায্য ছাড়া বড় হওয়া। টাকাপয়সা এলেই নাকি ঝামেলা শুরু হয়ে যায়।

সেই লোক ফিরে গিয়ে কী কথা বলেছে কে জানে, কিন্তু কয়দিন পরেই আমেরিকার এক কনফারেন্সে গিয়ে বক্তৃতা করার জন্যে অনুরোধ করে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি এসে হাজির। স্যার রাজি হওয়ার পর তারাই ভিসা টিকেট সব কিছুর ব্যবস্থা করেছে। যেদিন স্যারের ফ্লাইট, সেদিন নাকি এয়ারপোর্টে গ্রাম থেকে প্রায় তিন শ' মানুষ এসে হাজির। একটু পরপর শ্লোগান—

সরকার স্যার কই যায়

আমেরিকা, আর কোথায়?

ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রামের মানুষের স্বল্পবুদ্ধি নিয়ে বাড়াবাড়ি হতাশা প্রকাশ করলেও গলার স্বরে খুশিটুকু লুকিয়ে রাখতে পারলেন না।

কথা বলতে বলতে রাত প্রায় একটা বেজে গেল। তারিক ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে বলল, স্যার, অনেক রাত হয়েছে। এখন শুয়ে পড়েন।

হ্যাঁ বাবা, শুয়ে পড়ি। গত চব্বিশ ঘণ্টা দুই চোখের পাতা এক করতে পারি নাই। কোথায় শোব?

এই যে, বেডরুমের বিছানায়।

তোর বিছানায়? তুই কোথায় ঘুমাবি?

আমি সোফায় ঘুমাব।

সোফায়? স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, সোফায় আবার মানুষ ঘুমায় কেমন করে? এই তো বিছানাটা বড় আছে, দুই জনের আরামে জায়গা হয়ে যাবে, খামাখা সোফায় ঘুমাবি কেন?

তারিক বলল, স্যার, এই সোফাটা টানলে বিছানা হয়ে যায়।

সত্যি?

হ্যাঁ স্যার, এই দেখেন। তারিক তার হাইড-এ-বেডটি টেনে ভাঁজ করে থাকা অংশটি বের করে বড় বিছানা তৈরি করে ফেলল। দেখে সরকার স্যার চমৎকৃত হলেন, মাথা নেড়ে বললেন, বলেছিলাম না তোকে, এদের পেটে গু আছে। বলেছিলাম না?

শোওয়ার আগে তারিক সরকার স্যারকে জিজ্ঞেস করল, স্যার, ঘুমানোর আগে এক গ্লাস দুধ খাবেন স্যার?

দুধ? না রে বাবা, দুধ আর হজম করতে পারি না।

তা হলে অন্য কিছু? অরেঞ্জ জুস? আপেল জুস?

সেটা কী জিনিস?

ফলের রস। কমলার, না হয় আপেলের।

ফলের রসও পাওয়া যায়?

যায় স্যার।

টিপে টিপে রস বের করে বিক্রি করে?

যন্ত্রপাতি দিয়ে বের করে। খেয়ে দেখবেন এক গ্লাস?

দে দেখি। আপেলের রসটা দে দেখি।

তারিক বড় এক গ্লাস ভরে আপেল জুস নিয়ে এল। সরকার স্যার চমৎকৃত হয়ে তাকিয়ে রইলেন গ্লাসের দিকে। আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপেলটাকে টিপে রস বের করে?

মনে হয়।

রসটাকে টিপে বের করে তারপরে আপেলটাকে কী করে, ফেলে দেয়?

ফেলেই তো দেবে, না হয় কী করবে?

আপেলটা ফেলে দেয়! স্যার তখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না। রসটা রেখে

আপেলটাকে ফেলে দেয়?

তারেক মাথা চুলকে বলল, না হয় কী করবে?

দেশের কত মানুষ জীবনে কেউ একটা আপেল খেয়ে দেখে নি, আর এরা সেই আপেল ফেলে দেয়।

তারিক একটু অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, এভাবে যে জিনিসটা দেখা যায়, সে কখনো চিন্তাও করে নি।

স্যার অনেকক্ষণ আপেল জুসটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, না রে বাবা, আমি এটা খেতে পারব না।

সরকার স্যার এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে শুয়ে পড়লেন।

৮

সরকার স্যার তারিকের সাথে দু' সপ্তাহ থাকলেন। এই দু' সপ্তাহ স্যারের পিছনে তারিককে বেশ খানিকটা সময় দিতে হল। বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া, দর্শনীয় জিনিস দেখানো, কনফারেন্সের সেমিনারটিকে মোটামুটি গুছিয়ে দেয়া— এ ধরনের ব্যাপার ছাড়াও প্রতিদিন রান্না করে স্যারকে খাওয়াতে হত। এক দিন রান্না করে কয়েক দিন খাওয়া যেতে পারে, এই ব্যাপারটিই স্যারকে বোঝানো গেল না, তাঁর ধারণা রেফ্রিজিরেটর জিনিসটি তৈরি হয়েছে হাড়কেপ্পন বড়লোক মানুষের জন্যে। স্যার অবশ্য অত্যন্ত উৎসাহী মানুষ। শেষের দিকে ছোটখাটো জিনিস রান্না করা শিখে গেলেন। তারিক কাজ থেকে ফিরে এসে দেখত, সরকার স্যার ভাত রান্না করে অদ্ভুতার এবং ডাল রেঁধে ফেলেছেন। মাছ-মাংসজাতীয় জিনিসে হাত দিতে সাহস পেতেন না, তারিক এসে সেগুলি রান্না করত।

সেমিনার শেষ করে সরকার স্যার যখন তারিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিউ অর্লিন্স চলে গেলেন, তারিকের বেশ মন-খারাপ হয়ে গেল। মোটামুটি ক্ষ্যাপাগোছের সহজ সরল মানুষটি তারিকের দৈনন্দিন রুটিনবাঁধা জীবনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু শেষের দিকে সে সারাদিন কাজকর্ম করে রাতে সরকার স্যারের সঙ্গটির জন্যে অপেক্ষা করা শুরু করেছিল। দেশের সাথে তার যোগাযোগ নেই বহুদিন, সরকার স্যার হঠাৎ করে যেন একটা জানালা খুলে দিয়ে গেলেন। সেই জানালা দিয়ে একেবারে সত্যিকারের দেশটি দেখা যায়— আমজাদ সাহেবের দেশের সাথে তার কোনো মিল নেই।

সরকার স্যার একা একা নিউ অর্লিন্স এবং তারপর নিউ ইয়র্কের মতো জায়গা হয়ে কীভাবে দেশে ফিরে যাবেন সেটা নিয়ে তারিকের প্রথম বেশ দুশ্চিন্তা ছিল। স্যারকে দেখে কয়েক দিনেই টের পেয়ে গেল তার দুশ্চিন্তা অমূলক। স্যার ভালো ইংরেজি বলতে পারেন, যদিও তাঁর ইংরেজি চল্লিশ বছর আগের পাঠ্যপুস্তকের ইংরেজি এবং উচ্চারণের কারণে তিনি কারো ইংরেজি বুঝতে পারেন না এবং অন্য কেউও তাঁর ইংরেজি বুঝতে পারে না। দু' সপ্তাহ তারিকের বাসায় থেকে সে অবস্থার অনেক উন্নতি

হয়েছে। তাঁর নিজের উচ্চারণ এখনো কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু অন্যদের কথা আজকাল তিনি বেশ বুঝতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, পশ্চিমা দেশের রীতিনীতির মূল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন, বিদেশ নিয়ে খানিকটুকুর আতঙ্কটা আর নেই। স্যারকে এয়ারপোর্টে প্লেনে তুলে দেবার আগে তারিককে বুকে জড়িয়ে ধরে যখন ভেউভেউ করে কাঁদতে শুরু করলেন—তখন তারিকের চোখেও পানি এসে গেল, হাসিকান্নাজাতীয় ব্যাপারগুলি মনে হয় সংক্রামক।

সরকার স্যারকে প্লেনে তুলে দিয়ে সোজাসুজি ল্যাবরেটরিতে চলে এল তারিক। গত দু' সপ্তাহ কাজকর্মে ঢিল পড়েছিল, এখন সামলে নিতে হবে। উঁচু চেয়ারে বসে মাকড়শার জালের মতো সূক্ষ্ম স্টেনলেস স্টীলের তারটি হাতে নিয়ে সে খানিকক্ষণ উপুড় করে রাখা বোর্ডটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বোর্ডটিতে শ'খানেক লাইন দেয়া আছে, তার উপর দিয়ে এই স্টেনলেস স্টীলের তারগুলি বসাতে হবে, দু' পাশে টানটান করে ঝালাই করে দিতে হবে। স্টেনলেস স্টীল ঝালাই করা যায় না বলে তার জন্যে বিশেষ ফ্লাক্স আনা হয়েছে। জন বলছিল, এই ফ্লাক্স এবং র‍্যাটল স্নাকের বিষে বিশেষ পার্থক্য নেই, যেখানেই লাগবে সেই জায়গাটাই নাকি ঘা হয়ে খসে পড়ে যাবে। তার থেকে যে ধোঁয়া বের হয় সেটি নিঃশ্বাসের সাথে বুকের মাঝে গিয়ে ফুসফুসকে নাকি প্যাচপেচে জেলির মতো করে দেয় এবং কাশির সাথে তখন নাকি ফুসফুসের অংশবিশেষ বের হয়ে আসে। জনের বাড়িয়ে বলার অভ্যাস, তারিক তাই বেশি গা করে না, কিন্তু ফ্লাক্সটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাপ জিনিস, বোতলের উপর একটি করোটির ছবি, এবং নিচে বড় বড় করে লেখা "সাবধান বিষাক্ত দ্রব্য"।

তারিক একটা টিউ টিপে খানিকটা ফ্লাক্স লাগিয়ে মাইক্রোস্কোপের নিচে স্টেনলেস স্টীলের তারটি বসানোর চেষ্টা করতে থাকে। ব্যাপারটি সহজ নয়, এই মাইক্রোস্কোপে সবকিছু উল্টো দেখা যায়, কাজেই যখন স্টেনলেসের তারটিকে বাম দিকে সরানোর কথা মাইক্রোস্কোপে সেটাকে ডান দিকে সরাতে হয়, ব্যাপারটি চেষ্টা করে কিছুক্ষণেই তারিকের প্রায় মাথা-খারাপের মতো হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তারটিকে ঠিক জায়গায় রেখে কিউ টিপে ফ্লাক্স লাগানোর চেষ্টা করে। মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ না সরিয়ে এবারে হাতড়ে হাতড়ে সোল্ডারিং আয়রনটি এনে উত্তপ্ত টিপটি স্টেনলেস স্টীলের সূক্ষ্ম তারের উপর চেপে ধরে। সাথে সাথে বাষ্পীভূত ফ্লাক্সের ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। তারিক কাশতে কাশতে কোনোমতে সরে আসে। এই ব্যাপারটির জন্যে এর থেকে ভালো কোনো পদ্ধতি থাকা দরকার।

তারিক এবারে মিনিট দশেক সময় ব্যয় করে প্রস্তুতি নেয়। দুটি ছোট ফ্যান ঝাঁঝালো ধোঁয়াকে সরিয়ে নেবে, জানালায় একটা বড় ফ্যান ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস আনবে বাইরে থেকে। এবারে তারিক আবার মাকড়শার জালের মতো সূক্ষ্ম তারটিকে ঝালাই করার চেষ্টা করে। যে ছোট দুটি ফ্যান ঝাঁঝালো ধোঁয়াকে সরিয়ে নেবে, সেটা সোল্ডারিং আয়রনের টিপটিকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। নূতন একটা সোল্ডারিং আয়রন আনতে হল তারিকের, যেখানে টিপটির তাপমাত্রা ইচ্ছেমতো বাড়ানো কমানো যায়। সবকিছু ঠিক করে আবার সে ঝালাই করার চেষ্টা করে। ব্যাপারটি সহজ নয়, পাঁচ বারের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ঝালাই করা শেষ হয়। একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে যেই তার

মাথাটাকে সরানোর চেষ্টা করে, কনুইয়ের খোঁচা লেগে মাকড়শার জালের মতো সূক্ষ্ম তারটি পিং করে ছিঁড়ে গেল। তারিক মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, হারামজাদা শুওরের বাচ্চা, তোর চোদ্দ গুষ্টির আমি ইয়ে করি।

গালি খেয়েও সূক্ষ্ম স্টেনলেস স্টীলের তারটির কোনো ভাবান্তর হল না, তারিকের মেজাজ গরম করে দেবার জন্যে ফ্যানের বাতাসে নাচতে থাকল। খানিকক্ষণ বিষদৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে তারিক আবার গোড়া থেকে শুরু করে এবং আট মিনিটের মাথায় প্রথম তারটি ঠিক জায়গায় ঝালাই করে শেষ করতে পারে। এখনো এরকম শ'খানেক কাজ বাকি, চিন্তা করে তার পেটের মাঝে কেমন জানি পাক খেয়ে ওঠে। সব রিসার্চের মাঝেই কেমন জানি একটা নির্দয় ব্যাপার আছে, জিনিসটা সে আগেও অনেক বার লক্ষ করেছে।

দ্বিতীয় তারটি ঝালাই করা হল তের মিনিটের মাথায়। তৃতীয় তারটি আঠার মিনিটের মাথায়। পাঁচ মিনিটে একটা করে হলেও চোখ বুজে দশ ঘণ্টা লেগে যাবে। দশ ঘণ্টায় এই বিষাক্ত কাঁঝালো ধোঁয়া তার ফুসফুসের কী গতি করবে কে জানে। প্যাচপেচে জেলি হিসেবে কাশির সাথে ফুসফুস বের হয়ে আসছে চিন্তা করে তারিকের কেমন জানি গা গুলিয়ে আসতে থাকে।

সোল্ডারিং আয়রনটি সুইচ টিপে বন্ধ করে তারিক ঘর থেকে বের হয়ে আসে, তার খানিকটা বিরতি দরকার। লাইব্রেরিতে গিয়ে খবরের কাগজে চোখ বোলানো যায়, কমিক পৃষ্ঠাটি সে নিয়মিত পড়ে।

বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছে। ঝকঝকে নীল আকাশ। লস এঞ্জেলসের শুকনো বাতাসে কেমন জানি একটা সতেজ ভাব, একবার নিঃশ্বাস নিলেই কেমন জানি মনটা ভালো হয়ে যায়। তারিক বুক ভরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিল।

লাইব্রেরির দরজায় তারিক একটা শাড়িপরা মেয়েকে দেখতে পেল। এখানে শাড়িপরা মেয়ে খুব কম। কিছু ভারতীয় মেয়ে আছে, কিন্তু সবাই শার্ট-প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণ ভারতীয় একটি মেয়ে—যার স্বামী কুস্তিগীর, মাঝে মাঝে শাড়ি পরে, শ্রীলংকার একটি মেয়ে শুধু সবসময় শাড়ি পরে থাকে। তারিক একটু কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যায়, মেয়েটি লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু দেরি হলেই মেয়েটি লিফটে উঠে আটতলা লাইব্রেরির কোনো এক তলায় হারিয়ে যেত, কিন্তু তারিককে দেখে মেয়েটি লিফটে না ঢুকে তার দিকে এগিয়ে আসে। মেয়েটি মিলি, আমজাদ সাহেবের শ্যালিকা।

লাইব্রেরিতে যত জোরে কথা বলা নিয়ম তারিক তার থেকে একটু বেশি জোরে বলল, আরে মিলি! তুমি এখানে?

মিলির মুখ কেমন জানি খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, বলে, হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম, ইস, আপনার সাথে যদি দেখা হয়ে যেত। কী কপাল, সত্যি দেখা হয়ে গেল!

তারিক বলল, আমি তো আর ইউনিভার্সিটির ডীন না যে আমার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে হবে। ফোন করলেই তো হত।

আসলে আমি জানতাম না যে আপনাদের লাইব্রেরিতে আসব। একটা রেফারেন্সের দরকার ছিল, একজন বলল এখানে আসতে। আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে শাটল বাস আসে, আমি জানতাম না।

হ্যাঁ, আমি জানি।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কেটে যাবার পর হঠাৎ করে দু'জনেরই কথা শেষ হয়ে গেল। কথা চালিয়ে যাবার জন্যে এর পর কী বলা যায় তারিক চিন্তা করতে থাকে। 'স্কুল কেমন লাগছে', 'এখনো কি দেশের জন্যে মন খারাপ লাগছে', 'আমজাদ ভাইয়ের কী খবর', 'ভাবী কেমন আছেন' এই ধরনের কিছু-একটা বলতে গিয়ে তারিক হঠাৎ করে থেমে গিয়ে একটা সাহসের কাজ করে ফেলল, বলল, এত সুন্দর দিনে কী রেফারেন্স ঘাঁটাঘাঁটি করবে? চল কোথাও থেকে ঘুরে আসি।

এক মুহূর্তের জন্যে মিলির মুখে বিস্ময়ের একটা ছায়া পড়ে। ভদ্রভাবে একটা অজুহাত দিতে গিয়েও সে থেমে যায়। মুখে হাসি টেনে বলে, ঠিক বলেছেন। রেফারেন্সের খেতা পুড়ি।

তারিক এর আগে কখনো কোনো মেয়েকে 'খেতা পুড়ি' বলতে শোনে নি। একটু অবাক হয়ে মিলির দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে হা-হা করে হেসে ওঠে। লাইব্রেরির বেশ কিছু মানুষ ভুরু কুঁচকে তারিকের দিকে তাকাল, কিন্তু সে ভ্রুক্ষেপ করল না।

লাইব্রেরি থেকে বের হতে হতে তারিক ভাবল, কী অঘন্যভাবে দিনটি শুরু হয়েছিল, কিন্তু কী চমৎকারভাবেই না সেটা পাল্টে গেল!

গাড়ি দক্ষিণে সাগরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সাগর নয়, মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর। আপাতত লস এঞ্জেলসের ফ্রী ওয়েতে মহাসাগরের কোনো চিহ্ন নেই। ছয়টি লেনে পাশাপাশি গাড়ি একটি আরেকটিকে প্রায় স্পর্শ করে সত্তর মাইল বেগে ছুটে চলছে। এত গাড়িতে করে এত মানুষ সব সময় কোথায় ছুটতে থাকে ব্যাপারটা তারিককে সব সময়েই অবাক করেছে। সে সাবধানে লেন পরিবর্তন করে বলল, ভালোই হল, আমরা তিমিমাছ দর্শনে যাচ্ছি।

মিলি জানালার কাঁচটি একটু নামিয়ে দিয়ে বলল, কেন?

আমি কখনো যাই নি, শুনেছি খুব মজার। সত্যিকার তিমিমাছ সমুদ্রে লাফঝাঁপ দিচ্ছে, বুঝতেই পার।

তারিক মিলিকে তিনটি জায়গার কথা বলেছিল, তার মাঝে সে এটা বেছে নিয়েছে। অন্য দুটি ছিল হান্টিংটন লাইব্রেরি ও লা ব্রিয়া টার পিট। হান্টিংটন লাইব্রেরি আসলে হান্টিংটন নামে এক সৌখিন ধনকুবেরের বসতবাড়ি, যে প্রথমে তার এক বিত্তশালী চাচীকে বিয়ে করে এবং পরে রেলগাড়ির ব্যবসা করে অনেক টাকা উপার্জন করেছিল। লা ব্রিয়া টার পিট শহরের মাঝামাঝি একটা জায়গা, যেখানে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা আলকাতরার মাঝে আটকা পড়ে মরে পড়ে আছে। তৃতীয়টি এই তিমিদর্শন, যেখানে একটা ছোট জাহাজে করে দর্শকদের প্রশান্ত মহাসাগরে নিয়ে যাওয়া হয়—

বছরের এই সময়ে আলাস্কা থেকে তিমিমাছের দল এই পথ দিয়ে মেক্সিকো যায়।

মিলি জিজ্ঞেস করল, তিমিমাছ ধাক্কা দিয়ে জাহাজটাকে উল্টে দেবে না তো?

তারিক শব্দ করে হাসল, দিলে আর কী করা যাবে! দেশে খবরের কাগজে খবর উঠে যাবে, তিমিমাছ দর্শন করিতে গিয়া বাঙালি তরুণ-তরুণীর শোচনীয় মৃত্যু। জোর পুলিশি তদন্ত চলিতেছে।

পুলিশি তদন্ত? পুলিশি তদন্ত কেন?

এমনি বললাম আর কি। শোচনীয় মৃত্যুর কথা বললেই কেন জানি পুলিশি তদন্ত এসে যায়।

সামনের গাড়িগুলি থেমে যাচ্ছে, তারিক ব্রেকে পা দিয়ে বলল, আমার কপাল! যখন যে-লেনে থাকি তখন সেই লেনের গাড়ি আর নড়তে চায় না! দেখ দেখি পাশের লেনের কী অবস্থা!

অনেকই তো ভিড় দেখি!

পিছনের গাড়িটা কে চালাচ্ছে? ছেলে না মেয়ে?

ছেলে।

কী রকম চেহারা? রাগী রাগী নাকি?

কেন?

কী মনে হয়, সামনে গেলে গুলি করে দেবে?

গুলি! মিলি অবাক হয়ে বলল, গুলি কেন করবে?

তারিক হাসতে হাসতে বলল, তুমি জান না, লস এঞ্জেলসের রাস্তায় হঠাৎ করে কারো সামনে গাড়ি নিয়ে গেলে লোকজন মেজাজ খারাপ করে গুলি করে দেয়।

সত্যি?

হ্যাঁ। চিন্তা কর, যদি গুলি খেয়ে যাই, খবরের কাগজে উঠে যাবে, লস এঞ্জেলসের ফ্রী ওয়েতে আততায়ীর গুলিতে বাঙালি তরুণ-তরুণীর শোচনীয় মৃত্যু। জোর পুলিশি তদন্ত চলিতেছে।

মিলি হেসে বলল, পুলিশি তদন্ত ছাড়া আপনার মাথায় মনে হয় আজ আর কিছু নেই।

একেক দিন একেকটা শব্দ মাথার মাঝে ঢুকে যায়। সারা দিন শব্দটা ঘুরঘুর করতে থাকে। তোমার হয় না?

আমার? মিলি একটু ভেবে বলল, শব্দ হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে গানের লাইন ঢুকে যায়। সারা দিন মাথায় একটা গানের লাইন খেলতে থাকে।

গানের লাইন? কী সুন্দর, বাহ্! তুমি গান গাইতে পার?

না, পারি না। কতদিন কোনো গানটানও শুনি না ছাই! দেশে থাকতে প্রতিদিন দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে গান শুনতাম।

গান শুনবে তুমি? আমার কাছে অনেক বাংলা ক্যাসেট। এই গাড়িতেও আছে। দাও লাগিয়ে দিই। তারিক হাতড়ে হাতড়ে একটা ক্যাসেট বের করে লাগিয়ে দিতেই শচীন দেবের আনুনাসিক গলা গাড়িতে গুঞ্জন করে ওঠে,

মন দিল না বধু
মন নিল যে শুধু

আহা-হা— কী গলা। তারিক ভাবের আবেগে চোখ বন্ধ করতে গিয়ে থেমে যায় অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে একটা গাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

কোথায় জানি পড়েছিলাম আমি, একেকটা গান একেকটা সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তাই নাকি? মিলি একটু হেসে বলল, এই গানটা আপনাকে কোন সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়?

এই গানটা? তারিক একটু হেসে বলল, আমাকে কোনো সময়ের কথা মনে করায় না। কিন্তু জান?

কি? মিলির গলা হঠাৎ কেঁপে গেল, সে বুঝে যায় তারিক কি বলবে।

এর পর থেকে যখনই এই গানটি শুনব, আমার তোমার কথা মনে পড়বে।

মিলি কোনো কথা বলল না, সহজ হালকা একটা কথা বলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে, কিছুতেই সেরকম একটা কথা মনে করতে পারল না। অকারণে তার গাল দুটি একটু লাল হয়ে গেল।

সমুদ্রতীরে সমুদ্রের আঁশটে গন্ধ। ঝকঝকে সুন্দর দিন, তাই অনেক মানুষের ভিড়। ছোট ছোট দোকানগুলি ঘিরে মানুষজন ঘোরাঘুরি করছে, চারিদিকে কেমন একটা উৎসবের ভাব। সমুদ্রতীরে কাঠের পাটাতন পাতা। লোকজন অলসভাবে হাঁটছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারিক মিলিকে বলল, কিছু-একটা খেয়ে নেয়া যাক, কি বল?

এখন?

হ্যাঁ। জাহাজটা ছাড়তে এখনো এক ঘণ্টা। কী খাবে, বল।

কিছু খেতে পারি না আমি। যা গন্ধ সবকিছুতে।

এখনো খেতে পার না? কী মুশকিল! তারিক এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, এখানে মেক্সিকান খাবারের দোকান আছে। তুমি খেতে পারবে। বলব ঝাল করে তৈরি করে দিতে।

মেক্সিকান?

হ্যাঁ। খেয়েছ কখনো? টাকো? এনচিলাডা?

না।

তারিক উজ্জ্বল মুখে বলল, দারুণ খেতে!

খেতে গিয়ে দেখা গেল যত দারুণ ভাবা গিয়েছিল খাবার তত দারুণ নয়। সমুদ্রতটে শখের টুরিস্টের জন্যে খাবার দোকান— দোকানি খুব ভালো করে জানে, কেউ দ্বিতীয় বার ঘুরে এখানে খেতে আসবে না, তাই সেহারেই জোড়াতালি দেয়া আয়োজন। খাবারে খালি টকটক গন্ধ, তারিক নিজেই একরকম জোর করে খেল, মিলি একেবারেই সুবিধে করতে পারল না।

তারিক বেশ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আসলে মেক্সিকান খাবার এত খারাপ হয় না, অনেক মজার হয় খেতে। এখানে কী যে হল।

বেশ, ভালোই তো।

কিছুই তো খেলে না!

আমি এরকমই খাই।

এত কম খেয়ে কি বেঁচে থাকতে পারো? মরে যাবে একদিন।

মেয়েরা সহজে মরে না। মিলি হেসে বলল, শোনেন নি আপনি, মেয়েদের জান বিড়ালের মতো শক্ত?

তারিক মুগ্ধ দৃষ্টিতে মিলির দিকে তাকিয়ে থাকে। গত কয়েক ঘণ্টা তারা একসাথে, কিন্তু সারাক্ষণই ছিল পাশাপাশি। এই প্রথমবার তারা বসেছে মুখোমুখি। তারিক অবাক হয়ে মিলির চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে, এত সুন্দর একজনের চেহারা কেমন করে হয়! কী সুন্দর শরীর! যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু দেখতে কী কোমল আর মসৃণ! একবার স্পর্শ করার জন্যে তারিকের হাত নিশপিশ করতে থাকে।

মিলি বলল, কী হল আপনার?

তারিক থতমত খেয়ে যায়। প্রাণপণ চেষ্টা করে একটা বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলার জন্যে, মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বলে, বিড়ালের সাথে মেয়েদের জানের তুলনা করার কোনো সায়েন্টিফিক বেসিস নেই। বিড়ালের জান শক্ত, তার কি প্রমাণ আছে? নেই।

মেয়েদের হেনস্থা করা নিয়ে কথা। এর সায়েন্টিফিক বেসিস খুঁজলে তো মুশকিল।

মিলির দিকে তাকিয়ে আবার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কী সুন্দর দুটি ঠোঁট! লাল টুকটুকে কোনো একরকম ফলের মতো। ইচ্ছা করে দাঁত দিয়ে কুটুস করে একটা কামড় দিতে। কবি-সাহিত্যিকেরা কি খামোকা এই ঠোঁট নিয়ে লিস্তার পর লিস্তা কাব্য লিখে গেছে?

কী হল আপনার?

হ্যাঁ— তারিক দ্রুত কিছু-একটা বলার চেষ্টা করে, মেয়েদের হেনস্থার কথা বলছ, সেটা কি সত্যি? আমার তো মনে হয় আমাদের সোসাইটিতে আমরা মেয়েদের বেশ ভালো সম্মানই দিই।

মিলি আবার কী-একটা বলে, তারিক ঠিক শুনতে পেল না। মুগ্ধ হয়ে সে তার

দাঁতগুলি লক্ষ করে। এত সুন্দর কারো দাঁত হতে পারে? লাল ঠোঁটের পিছনে সাদা দাঁতগুলি দেখতে কী সুন্দরই না লাগছে!

কি হল? চুপ মেরে গেলেন যে?

এবারে তারিক আর বুদ্ধিদীপ্ত কিছু বলার চেষ্টা করল না। বেশ সহজভাবে বলে ফেলল, মিলি, আসলে আমি সব সময় গুছিয়ে কথা বলতে পারি না।

কেন?

মানে ইয়ে—মনে হয় স্কুল কলেজে মেয়েদের সাথে বেশি মেশার সময় পাই নি তাই মেয়েদের সাথে কথা বলতে গেলে কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। বিশেষ করে তোমার সাথে— তোমার চেহারা এত ভালো যে প্রত্যেকবার তোমার দিকে দেখছি আর— তারিক থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে বলল, তুমি কিছু মনে করলে না তো, প্লীজ?

মিলি একটু অবাক হয়ে তাকাল তারিকের দিকে। মনে হল চোখে এক ধরনের বিষণ্ণতা এসে ভর করেছে। তারিক একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, প্লীজ, তুমি কিছু মনে করো না। আমি মানে—ইয়ে—

মিলির চেহারায় কেমন জানি একটা দুঃখের ছায়া পড়ে। আস্তে আস্তে বলে, তারিক ভাই, আপনাকে একটা কথা বলি।

তারিক শঙ্কিতভাবে বলল, কী কথা?

মিলি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তারিকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, না, থাক।

থাকবে কেন, বল।

নাহ্, কিছু না।

বল। কী হল?

অন্য কখনো বলব।

ঠিক আছে।

দু' জন চুপচাপ বসে থাকে। এত সুন্দর একটা পরিবেশ এভাবে নষ্ট করার জন্যে তারিকের নিজেকে জুতা মারার ইচ্ছে করতে থাকে। মেয়েদের চেহারা ভালো হলে মেয়েরা খুশি হয় বলে শুনেছিল। গাধার মতো সেটা চেষ্টা করে কী বেকুবই না সাজল মেয়েটার সামনে! তারিক কেমন জানি একটা সূক্ষ্ম অপমান অনুভব করে। আস্তে আস্তে বলল, মিলি।

কী হল?

তুমি কি— তুমি কি ফিরে যেতে চাও?

ফিরে যাব?

হ্যাঁ। আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি।

মিলি খুব অবাক হল,বলল, কেন? আপনি তিমিমাছ দেখতে চান না?

আমি তো চাই। কিন্তু তুমি—মানে—ইয়ে—

কী হল আপনার? এত কষ্ট করে এলাম—

হঠাৎ করে তারিকের মনটা আবার ভালো হয়ে যায়। কী চমৎকার মেয়েটি! আহা, একটিবার যদি মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারত!

খাবারের দাম দিল মিলি। জাহাজের টিকিটও কাটল মিলি। আজ নাকি সে তার জীবনের প্রথম নিজের উপার্জনের টাকা পেয়েছে। কিন্তু– একটা খরচ করে দেখতে চায়, অন্তত সেটাই তারিককে বুঝিয়েছে। তারিক খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বুঝতে পেরেছে মিলি সত্যিই তাই চায়, ভদ্রতা করার চেষ্টা করছে না। তারিক আর আপত্তি করল না, বরং ব্যাপারটাতে একটা মেয়েসুলভ কোমলতার চিহ্ন খুঁজে পেতে শুরু করে।

তিমিমাছ দেখতে যাওয়ার জন্যে তারা যে–জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেটি ছোট নড়বড়ে একটা লঞ্চ। তিমিমাছ দেখার জন্যে সেই নড়বড়ে লঞ্চেই অনেক মানুষ গাদাগাদি করে উঠেছে এবং লঞ্চটি ঠিক সময়মতো বিকট গর্জন করে সমুদ্রের দিকে রওনা দিল। মোহনাটি পার হয়ে বড় একটা বাতিঘর পাশ কাটিয়ে মূল সমুদ্রে হাজির হওয়ামাত্র বড় বড় ঢেউয়ে ছোট লঞ্চটি কাগজের নৌকার মতো দুলতে থাকে। ব্যাপারটি সম্ভবত খুব আনন্দের, কারণ কয়েকজন ছোট ছোট বাচ্চাকে অত্যন্ত উল্লসিত দেখা গেল। কিন্তু যাদের অভ্যেস নেই এবং যারা দুলুনি সহ্য করতে পারে না, তাদের জন্যে এর থেকে ভয়ংকর আর কিছু হতে পারে না। মিলিকে প্রথমে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, তারপর প্রায় হঠাৎ করেই তারিককে দু' হাতে জাপটে ধরে একটু আগে খেয়ে আসা মেক্সিকান খাবার হুড়হুড় করে বমি করে দিল। নিচে একজনের মাথা বাঁচিয়ে সেই খাবার সমুদ্রের পানিতে পড়ে মেক্সিকোর দিকে দক্ষিণে ভেসে যেতে থাকে। সেই দিকে তাকিয়ে মিলি ফ্যাকাসে মুখে ফিসফিস করে বলল, আমি মনে হয় মরে যাব।

তারিক কী করবে বুঝতে পারল না। মিলি তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। তার দেহ অনেক কোমল হতে পারে, কিন্তু তার আঙুল নিঃসন্দেহে শক্ত এবং সেখানে বেশ জোর। বড় আরেকটা ঢেউয়ে লঞ্চটি দুলে উঠতেই তারিক মিলিকে জড়িয়ে ধরে বলল, মিলি! তুমি মরবে না।

মিলি ফ্যাকাসে মুখে আবার বলল, আমি মরে যাচ্ছি। তারপর সারা শরীর কাঁপিয়ে দ্বিতীয় বার বমি করার চেষ্টা করল। আশেপাশে যারা ছিল তারা ছিটকে সরে গেল, মিলি বিকট শব্দ করে বমি করার চেষ্টা করল, কিন্তু পেটে যা ছিল প্রথম বারেই বের হয়ে এসেছে, এবারে বিশেষ কিছু বের হল না।

কালো রংয়ের সহৃদয়গোছের একজন মানুষ এগিয়ে এসে তারিককে জিজ্ঞেস করল, তোমার স্ত্রী প্রেগনেন্ট?

তারিক প্রবলবেগে মাথা নাড়ল, না না, আমার স্ত্রী না।

লোকটি দাঁত বের করে হেসে বলল, গার্লফ্রেন্ড?

তারিক কথা না শোনার ভান করে। লোকটি তবু পিছনে লেগে থাকে, প্রেগনেন্ট,

নাকি সী সিক?

সী সিক।

ও! লোকটি সবকিছু বুঝে ফেলার মতো একটা ভঙ্গি করে বলল, দূরে তাকাতে বল। দূরে—অনেক দূরে। সী সিক হলে কাছে তাকাতে হয় না। সবসময় দূরে তাকাতে হয়। কানের মাঝে একটা তরল থাকে, সেটা নিয়ে ব্যালেন্স হয়, দুলুনিতে সেটা নষ্ট হয়ে যায়।

বিনি পয়সায় উপদেশ এবং জ্ঞানদান করেও লোকটি চলে গেল না, বেশ কাছে মুখে একটা স্মিত হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটিতে সে বেশ আনন্দ পাচ্ছে।

মিলি ঘোলাটে চোখে তারিকের দিকে তাকিয়ে বলল, বাথরুমটা কোথায়?

কালো মানুষটি হাত দিয়ে দেখায়, এই তো এখানে। সোজা সামনে গিয়ে ডান দিকে। ডান দিকে মেয়েদের বাথরুম। বাম দিকে ছেলেদের। পরিষ্কার বাথরুম। তাড়াতাড়ি যাও, একটু পর ময়লা হয়ে যাবে। এত মানুষ, মাত্র একটা বাথরুম। যাও যাও, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও তাড়াতাড়ি। সরি, স্ত্রী তো না, গার্লফ্রেন্ড। গার্লফ্রেন্ড।

তারিক মিলিকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যায়।

সমুদ্রের গভীরে গিয়ে যখন সত্যি সত্যি একপাল তিমিমাছের সন্ধান পাওয়া গেল, লঞ্চের লোকজনের আনন্দের আর সীমা রইল না। ক্যামেরায় ছবির পর ছবি উঠতে থাকে, ভিডিও ক্যামেরা চোখে লোকজন ছোটাছুটি করতে থাকে। তিমিমাছগুলি বিকট শব্দ করে মাথার ফুটো দিয়ে ফোয়ারার মতো পানি ছড়িয়ে দিচ্ছিল, সেখে তাক লেগে যায়। তারিক মিলিকে বাথরুমে ডাকাডাকি করে এল, কিন্তু মিলি বের হল না। তিমিমাছ দূরে থাকুক, স্বয়ং বিধাতা নেমে এলেও মিলির দেখার কোনো কৌতূহল হত বলে মনে হয় না। তারিক বাথরুমের সামনে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, সমুদ্রের নীল পানিতে বিশাল তিমিমাছগুলি শিশুদের মতো খেলছিল, অপূর্ব একটি দৃশ্য, কিন্তু তারিক সেটি একেবারেই উপভোগ করতে পারছিল না।

মিলি সম্ভবত বাথরুম থেকে বের হত না, কিন্তু লঞ্চের আরো কিছু মহিলা সী সিক হয়ে গেল, একটি মোটে বাথরুম, কাজেই মিলিকে বের হয়ে আসতে হল। কিছুক্ষণের মাঝেই তার চেহারা পাল্টে গেছে, লাল চোখ, চোখের নিচে কালি, শুকনো ঠোঁট এবং কেমন যেন ভীত চেহারা, দেখে তারিকের বুকের ভিতর মোচড় খেতে থাকে। মিলিকে মনে হচ্ছিল দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, তারিক তাকে শক্ত করে ধরে বলল, তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, জীবনে আর কখনো তোমাকে কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করব না। আমি এই বুক ছুঁয়ে বলছি।

মিলি দুর্বলভাবে একটু হাসার চেষ্টা করল। খুব লাভ হল না। লঞ্চের রেলিং ধরে কোনোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘণ্টা দুয়েক পর সমুদ্রের তীরে কাঠের একটা বেঞ্চে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে মিলি একটা ভেজা রুমাল দিয়ে নিজের মুখ মুছে বলল, আমাকে নিশ্চয়ই এখন ভূতের মতো দেখাচ্ছে?

তারিক বলল, তোমাকে কেমন লাগছে সেটা নিয়ে তুমি এখন মাথা ঘামিও না—

তার মানে ভূতের মতো লাগছে?

না, তোমাকে মোটেও ভূতের মতো লাগছে না।

পেত্নীর মতো লাগছে?

তারিক হেসে বলল, হ্যাঁ, সেটা ঠিক বলেছ, খানিকটা পেত্নী পেত্নী ভাব এসে গেছে। কিন্তু তোমার কেমন লাগছে? একটু ভালো লাগছে?

না।

তোমার কি এখনো মনে হচ্ছে মরে যাবে?

না, তা মনে হচ্ছে না।

তা হলে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। ওঠ, একটু হাঁট, কিছু-একটা খাও, দেখবে ভালো লাগবে।

খাব? মিলি মুখ কুঁচকে বলল, মা গো, ছিঃ!

একটু চা কফি, একটু আইসক্রীম?

না, না, না— মিলি জোরে জোরে মাথা নাড়ে। আমি সামনে পুরো এক বছর কোনো খাওয়াখাওয়ির মাঝে নেই। একটু পর মুখ তুলে বলল, ইস! কী লজ্জা, আপনার সামনে বমি করে দিলাম।

লজ্জার কী আছে? শরীর খারাপ লেগেছে, বমি করেছ।

ছিঃ! তাই বলে সবার সামনে? মা গো, ছিঃ! আপনি কাউকে বলবেন না প্লো!

কাকে বলব আমি? তারিক কোমল স্বরে বলল, তোমাকে দেখে আমার এত কষ্ট হচ্ছিল, কী বলব! আমি যদি জানতাম, কখনই তোমাকে আমি এখানে নিয়ে আসতাম না। নেভার এগেন।

আপনি কেমন করে জানবেন? আমিই জানি না।

চল, ওঠ। একটু হাঁটাহাঁটি করা। ভালো লাগবে।

মিলি উঠে দাঁড়াল, শাড়িটা একটু ঠিক করে নিয়ে বলল, আশেপাশে কোনো বাথরুম আছে? হাত-মুখটা একটু ধুয়ে নিতাম।

হ্যাঁ। চল নিয়ে যাই।

বাথরুম থেকে যখন মিলি বের হয়ে এল, তখন তার ঝকঝকে সতেজ চেহারা— গত কয়েক ঘণ্টার সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কোনো ছাপ নেই। নিশ্চয়ই চুল ঠিক করেছে,

ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়েছে, কপালে বাঁকা হয়ে থাকা টিপটা ঠিক জায়গায় বসিয়েছে, মুখে পাউডারের প্রলেপ দিয়েছে। তারিক দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

সমুদ্রতীরের জায়গাটা একটা মেলার মতো। চারপাশে নানারকম খেলার আয়োজন, ফেরিওয়ালা ঘুরছে, ছোট ছোট দোকানে মজার মজার জিনিসপত্র, খেলনা, খাবারদাবার। লোকজন হাটাহাঁটি করছে, কেনাকাটা করছে। এক পাশে গিটার বাজিয়ে গান গাইছে একজন বেসুরো গলায়, সামনে খোলা হ্যাটে পয়সা দিচ্ছে মানুষজন। ছবি আঁকছে একজন— পাঁচ ডলার দিলেই চেহারা ফুটিয়ে দেবে সাদা কাগজে। বেলুন নিয়ে যাচ্ছে একজন, মনে হচ্ছে ইচ্ছিয়াম বেলুন বুঝি উড়িয়ে নেবে এক্ষুনি। সস্তা দোকানে রংচংয়ে প্লাস্টিকের খেলনার পাশাপাশি অর্ধনগ্ন মেয়েদের ছবি, অশ্লীল কিছু জিনিসপত্র মোটামুটি প্রকাশ্যে ছড়িয়েছিটিয়ে রাখা, অন্য সময় হলে চোখ বুজিয়ে যেত, আজকে না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে গেল। এক পাশে নাগরদোলা ঘুরছে, ছোট বাচ্চাদের লম্বা লাইন। একজন স্বর্ণকেশী মহিলা তাস দেখে ভাগ্য বলে দিচ্ছে নামমাত্র মূল্যে। স্বল্প পোশাকে ঘোরাঘুরি করছে কিছু বিশালবক্ষা তরুণী এবং পেশীসর্বস্ব তরুণ। হাওয়াই মিঠাই বিক্রি করছে একজন। দেয়ালে হেলান দিয়ে প্যাকেটে ঢেকে রাখা বোতল থেকে মদ খাচ্ছে কিছু নেশাগ্রস্ত মানুষ। গুমগুম শব্দে ভিডিও গেম খেলা হচ্ছে এক পাশে, ছটফটে কিশোরেরা সমস্ত একমাত্রা নিয়ে খেলছে ভিডিও গেম।

উৎসবের আনন্দ চারদিকে। প্রথমে তারিক আর মিলি সেই উৎসবে বাইরের মানুষ হিসেবে ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ। কিছুক্ষণের মাঝে দেখা গেল তারাও সেই উৎসবে যোগ দিয়েছে। রবারের কিছু বাঙ্গকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পানিতে ফেলার একটা অত্যন্ত ছেলেমানুষি খেলায় মিলি খুব উৎসাহী হয়ে পড়ল। তারিক দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কিছু খেলনা-ভৌদড়কে গর্ত থেকে মাথা বের করা থেকে বিরত করতে পারল না। ব্রোঞ্জ ঢেপে যাওয়ায় অনেকগুলি পয়সা বের হয়ে গেল তারিকের পকেট থেকে। দু' জনে মিলে ভিডিও গেমে বেশ কিছুক্ষণ শত্রু মহাকাশযান ধ্বংস করল গুলি করে। মিলি রেড ইন্ডিয়ান এক মহিলার কাছ থেকে নীল পাথরের এক জোড়া কানের দুল কিনল, তারিক কিনল দেখতে প্রায় সমি। মনে হয় সেরকম রবারের একটা র‍্যাটল সাপ।

মিলির শরীর নিশ্চয়ই ভালো লাগতে শুরু করেছে। কারণ তারিক যখন আইসক্রীম খাবার কথা বলল, এবারে সে আর আপত্তি করল না। দু' জনে বেঞ্চে বসে আইসক্রীম খেল। বিশাল আইসক্রীম, খেয়ে শেষ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত যখন শেষ করল, তখন দু' জনেরই শীত শীত করতে থাকে। মিলির ঠিক তখন মনে হল, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এখন ফিরে যেতে হবে।

তারিক ঘড়ি দেখে বলল, খুব মজা হল আজকে, কি বল?

হ্যাঁ। সত্যি খুব মজা হল।

তোমার যদি সী সিকনেসটা না হত—

ও আচ্ছা, তাই তো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ইস, কী লজ্জা! সবার সামনে ওয়াক ওয়াক করে বমি! ছিঃ!

তোমাদের এটা ভারি আশ্চর্য। নিজের কষ্ট হচ্ছে সেটা কিছু নয়, কিন্তু অন্যেরা কী ভাবছে সেটা চিন্তা করে ঘুম নেই।

থাক থাক, আপনাকে আর লেকচার দিতে হবে না। আপনি যেদিন কারো ঘাড়ে বমি করে দেবেন, তখন জিজ্ঞেস করব।

তুমি কি ভেবেছ আমি কখনো করি নি?

মিলি উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, করেছেন? কবে?

তারিক মুখে রহস্যের ভান করে বলল, সেটা বলা যাবে না।

কেন?

ভারি লজ্জার ব্যাপার।

তা হলে? দোষ খালি আমার?

তারিক মাথা নাড়ে। আমার তখন তোমার জন্যে এত মায়া লাগছিল, কী বলব! মনে হচ্ছিল, ইস, কিছু যদি করতে পারতাম!

কী করতে চাচ্ছিলেন?

গিয়ে বোটের ক্যাপ্টেনের চুলের ঝুটি ধরে বলতাম, শালা, তোমার তিমিমাছের খেতা পুড়ি। এই মুহূর্তে ফিরে চল—

মিলি হি-হি করে হাসতে হাসতে প্রায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারে না। চোখে পানি এসে গেল হাসতে হাসতে।

মিলিকে দেখতে দেখতে তারিকের বুকের ভিতর সবকিছু যেন নড়েচড়ে যেতে থাকে। আহা! এই অসম্ভব সুন্দর কোমল মেয়েটিকে কি সে পেতে পারে না কোনোভাবে?

গাড়ি করে ফিরে আসার সময় আবার শচীন দেব খুব দরদ দিয়ে গাইলেন মন দিল না বধূ —। মিলি খুব বিষণ্ন মুখে বসে রইল গাড়িতে। কয়েক বার কী-একটা বলতে চাইল তারিককে, কিন্তু বলতে পারল না।

তারিক বিছানায় আধশোয়া হয়ে পাশের টেবিল থেকে কিছু বইপত্র টেনে নেয়। মনের ভিতরে তার কেমন জানি হালকা একটা আনন্দ। ঘুরেফিরে মিলির কথা মনে পড়ছে তার। প্রেম ব্যাপারটি কি এভাবেই শুরু হয়?

তারিক হাতের বইপত্রগুলির দিকে তাকায়। অনেকদিন থেকে ভাবছে সে ভালো কিছু পড়বে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, বিশ্বসভ্যতায় প্রযুক্তির স্থান, মায়া ও ইনকা সভ্যতা বা এই ধরনের গুরুগম্ভীর কিছু। কিছু বইপত্র কিনেও রেখেছে সে। কিন্তু প্রতিদিন ঘুমানোর সময় সে ঘুরেফিরে হালকা কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে বসে। কম্পিউটারের ক্যাটালগ, ফটোগ্রাফির কিছু ম্যাগাজিন ঘাঁটাঘাঁটি করে। নূতন কী বের হচ্ছে, কত দাম, কোথায় পাওয়া যায় এইসব দেখে তার বেশ সময় কেটে যায়। আজকেও তাই করছে, ঠিক সে-সময় হঠাৎ টেলিফোন বাজল। তারিক ঘড়ির দিকে

তাকায়, রাত সাড়ে দশটা বাজে, তার জন্যে এটা বেশি রাত নয়। তবে সাধারণত এরকম সময়ে ফোন আসে না। বিছানায় শুয়েই সে ফোন ধরল, হ্যালো।

তারিক ভাই, আমি মিলি।

মিলি! তারিকের মুখ এক শ' ওয়াট বাল্বের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, কী খবর তোমার, মিলি?

না, মানে ইয়ে আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

কী জিনিস?

আপনি কি শুয়ে পড়েছেন?

না না, শুই নি।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তারিক হেসে বলে, ঘুমাতে ঘুমাতে আমার বারটা বেজে যায়। কী জিজ্ঞেস করবে?

আমি জানি না আপনি জানেন কি না।

সম্ভবত জানি না, আমি খুব বেশি জিনিস জানি না। তবু তুমি জিজ্ঞেস করতে পার। কী?

ইয়ে— মিলি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে একসময় প্রায় মরিয়া হয়ে বলে, আমার পরিচিত একটা ছেলে আছে ঢাকায়। আমাদের সাথে পড়ত বায়োকেমিস্ট্রিতে। পড়াশোনাতে সেরকম ভালো না। সে যদি আমেরিকা আসতে চায়, তার কি কোনো উপায় আছে?

তারিক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার পরিচিত ছেলে?

মিলি মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ।

তারিক আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি আজ দুপুরে আমাকে এটা বলতে চেয়েছিলে?

মিলি একটু ইতস্তত করে বলল, হ্যাঁ।

তারিক অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি আসলে জানি না কীভাবে আসা যায়। তা ছাড়া— তারিক একটু থেমে বলল, তুমি তো সত্যিই আমার কাছে জানতে চাইছ না ছেলেটা কীভাবে আসবে, তুমি আসলে আমাকে জানাতে চাইছ যে, ঢাকায় তোমার একজন পরিচিত ছেলে আছে। একজন— একজন ভালবাসার ছেলে—

মিলি কোনো উত্তর দিল না। তারিক আস্তে আস্তে বলল, মিলি—

মিলি খুব আস্তে আস্তে, প্রায় শোনা যায় না স্বরে বলল, হ্যাঁ।

থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিলি। তারিক জোর করে একটু হাসির মতো শব্দ করে বলল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

মিলি কোনো উত্তর দিল না। দু' জন দু' পাশে টেলিফোন ধরে বসে রইল, কিন্তু ঠিক কী বলবে বুঝতে পারল না। কীভাবে কথা শেষ করে টেলিফোন রাখবে সেটা নিয়েও একটু সমস্যা হল। শেষ পর্যন্ত কিছু-একটা বলে মিলি টেলিফোনটা রাখার পরও তারিক অন্যমনস্কভাবে টেলিফোনটা কানে ধরে রাখে। হঠাৎ করে তার মনে হতে থাকে বুকের ভিতর যেন খানিকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। মনে হতে থাকে কেউ যেন খানিকটা অংশ ধারালো চাকু দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে।

দীর্ঘসময় সে হাঁটু ভাঁজ করে বিছানায় বসে রইল। সবকিছু কেমন যেন অর্থহীন মনে হচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কিছু-একটা করতে হবে তার। ধীরে ধীরে সে কাপড় পরে, টেবিল থেকে গাড়ির চাবি আর মানিব্যাগ নিয়ে অন্যমনস্কভাবে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

গাড়ি স্টার্ট করে সে দীর্ঘসময় স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে থাকে। কোথায় যাবে এখন? ফরিদের মতো লাল বাতির ভিতর দিয়ে চালাবে? না, সেটা একটু বেশি নাটকীয় হয়ে যায়। কোনো বারে বসে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাবে? দেবদাসের মতো? তারিকের হাসি পেল একটু। সে বারে গিয়ে কখনো মদ খায় নি, কেমন করে খেতে হয় জানে না। মদের নাম ধরে কি বলতে হয় যে অমুক মদটা এক গ্লাস দাও? নাকি বললেই হয় এক গ্লাস হুইস্কি? যদি জিজ্ঞেস করে কোন হুইস্কি, তাহলে কী বলবে? দি স্কারলেট সানের নায়ক যে-হুইস্কি খেয়েছিল সেই হুইস্কি?

তারিক গাড়ি নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। ছোট ছোট রাস্তা গলি হয়ে বড় রাস্তা ফ্রী ওয়ে হয়ে আবার ছোট রাস্তায়। ঘুরেফিরে একসময় সে নিজেকে আবিষ্কার করে তার ল্যাবরেটরির সামনে।

রাত সাড়ে এগারটার সময় তারিক বোর্ডের উপর ঝুঁকে মাকড়শার জালের মতো সূক্ষ্ম স্টেনলেস স্টীলের তার ঝালাই করা শুরু করে। যখন তার কাজ শেষ হয়, তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটা বাজে, বাইরে অন্ধকার হালকা হয়ে আসতে শুরু করেছে।

৯

জামাল বিছানায় আধশোয়া হয়ে টেলিভিশন দেখছে। ঠিক দেখছে নয়, চোখ বোলাচ্ছে। তার হাতে রিমোট কন্ট্রোল, একটা চ্যানেল খানিকক্ষণ দেখে পাল্টে অন্য চ্যানেলে চলে যাচ্ছে। এইচ. বি. ও. চ্যানেলে একটি অশ্লীল দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। রাত গভীর হলে সিনেমার চ্যানেলগুলিতে এরকম রগরগে দৃশ্য দেখানো হয়। জামাল কয়েক মুহূর্ত দেখে চ্যানেল পাল্টে ফেলল। এই মুহূর্তে মানব-মানবীর ভালবাসার দৃশ্য দেখতে ভালো লাগছে না। তার বুকের উপর নগ্নদেহে শুয়ে আছে লিজা। চোখ বন্ধ, মুখ অল্প খুলে রেখেছে। ঠোঁটের লিপস্টিক সারা মুখে মাখামাখি হয়ে আছে। লিজা ঘুমের মাঝেই এক হাত দিয়ে জামালকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। যেন হাত একটু আলগা করলেই সে হাতছাড়া হয়ে যাবে। জামাল লিজার অসম্ভব সুন্দর দেহটি একবার দেখে চোখ

সরিয়ে নেয়। ভালবাসাবাসির পর সব সময়েই সে নারীদেহের উপর এক ধরনের বিতৃষ্ণা অনুভব করে।

গভীর রাত্রিতে বুকের উপর নগ্ন একটি মেয়েকে শুইয়ে রেখে টেলিভিশনে অর্থহীন কোনো অনুষ্ঠান দেখার ব্যাপারটিতে কেমন জানি একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব আছে। ঠিক কোন অংশটি দুঃখের সে ধরতে পারছে না। জামাল বিছানায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে। সে কি এরকম একটা জীবন চেয়েছিল?

সে নাকি অসম্ভব সুদর্শন। সুদর্শন কথাটি কোথাও ভালো করে ব্যাখ্যা করা নেই। জামাল অসংখ্যবার নিজেকে আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে, তাকে তার সুদর্শন মনে হয় নি। তার নাক, মুখ গ্রীক দেবতার ধাঁচে তৈরি হয় নি, তার গায়ের রং স্বচ্ছ মার্বেলের মতো নয়, তার চোখে নীল অতলান্ত সমুদ্রের গভীরতা নেই, বরং তার চেহারায় কেমন এক ধরনের পশু পশু ভাব। কিন্তু নিশ্চয়ই তার চেহারায় কিছু-একটা আছে, যেটা মেয়েদের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। তা যদি না হত, তা হলে কেন যখন তার বয়স চোদ্দ বছর, তখন কুড়ি বছরের স্বাতী আপা তাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলেন? স্বাতী আপা এখন বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন, তিন মেয়ের মা, স্বামী বেচারার মাথায় বিস্তৃত টাক। কোনোদিন যদি দেখা হয় আর সে যদি বলে, স্বাতী আপা, মনে আছে একদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের বাতি নিভিয়েছিলেন? মনে আছে?

জামাল ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। কত অল্প বয়সেই না সে আবিষ্কার করেছিল সে এবং তার দেহ দু'টি ভিন্ন জিনিস!

এদেশে এসে তার কত মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছে? ঘনিষ্ঠতা হয়েছে? হিসেব রাখতে পারে না সে। কতবার হয়েছে, মেয়েটিকে ঘরে এনে তুলেছে, ভালবাসাবাসি করে চলে গিয়েছে—নাম জিজ্ঞেস করা হয় নি। তার শরীর এবং তার মন, ধীরে ধীরে দু'টির ভিতরে যেন দূরত্ব শুধু বেড়েই চলেছে। দু'টি যেন ভিন্ন অস্তিত্ব, কারো সাথে কারো কোনো যোগাযোগ নেই।

বুকের মাঝে শুয়ে থেকে লিজা চোখ খুলে তাকাল জামালের দিকে, মুখটি উপরে তুলে চুমু খেল একবার জামালকে, তারপর আবার চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েটির আশ্চর্য নিষ্পাপ একটি চেহারা, কিন্তু তাকে দেখে জামাল কেমন জানি একটি বিতৃষ্ণা অনুভব করতে থাকে।

কতদিন থাকবে লিজা তার সাথে? এক সপ্তাহ? দু' সপ্তাহ? এক মাস? তার বেশি নয়। কোনো মেয়েকে কি সে এক মাসের বেশি রেখেছে নিজের সাথে? মনে হয় না।

টেলিফোন বেজে উঠল হঠাৎ। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না এখন। কয়েক বার বেজে থেমে যাবে নিশ্চয়ই। জামাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। সত্যি কয়েক বার বেজে থেমে গেল, তারপর প্রায় সাথে সাথেই আবার বাজতে শুরু করল।

জামাল হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলে, হ্যালো।

এটা কি জামাল আমেদের বাসা? একটি মেয়ের গলা। জামাল শব্দটি ঠিক করেই উচ্চারণ করেছে, কিন্তু আহমেদ কথাটিকে বলেছে আমেদ। কখনই এরা আহমেদ কথাটি ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না।

জামাল বলল, হ্যাঁ।

আমি কি জামাল আমেদের সাথে কথা বলতে পারি?

কথা বলছি।

তোমার ঘরে কি আর কেউ আছে?

কেন?

আমি তোমার সাথে একা কথা বলতে চাই।

জামাল লিজার দিকে এক নজর তাকাল। মেয়েটি ঘুমিয়েই আছে, ঘরে থাকা না-থাকায় এখন আর কিছু আসে যায় না। বলল, আমি একাই আছি।

তুমি কি দাঁড়িয়ে আছ?

কেন?

আমি চাই তুমি কোথাও বস।

আমি বসেই আছি।

বেশ। মেয়েটি এক মুহূর্ত থেমে থেকে বলল, আমি তোমাকে এখন এমন একটি কথা বলব, যেটা তোমার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জামালের হঠাৎ করে কেমন জানি ভয় লাগতে থাকে। ঢোক গিলে বলল, তুমি কে কথা বলছ, কোথা থেকে বলছ?

আমি সানফ্রানসিস্কো সংক্রামক ব্যধি দপ্তর থেকে কথা বলছি। আমার নাম ক্যারল রডরিগাস। আমাদের সেন্টারে একটি মেয়ে এসেছে, তার নাম সিনথিয়া অ্যাডামস। তার শরীরে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস ছিল, এখন সেটা পরিপূর্ণ এইডস হিসেবে দেখা দিয়েছে।

তুমি আমাকে কেন সেটা বলছ?

সেই মেয়েটির ব্যাসের সাথে নৈতিক সম্পর্ক ছিল, আমরা তাদের সবার সাথে যোগাযোগ করছি। সিনথিয়া অন্য অনেকের সাথে আমাদেরকে তোমার নামও বলেছে। তোমার কি এই মেয়েটির সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল?

সিনথিয়া অ্যাডামস। জামালের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। লালচুলের ক্যাপাগোছের মেয়েটি। ভালবাসাবাসির চরম মুহূর্তে যে সবসময় তাকে ধরে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিত।

হয়েছিল সম্পর্ক তোমার সাথে?

জামাল শুষ্ক স্বরে বলল, হ্যাঁ, সিনথিয়া আমার সাথে এক সপ্তাহ ছিল।

তোমার তারিখটি মনে আছে?

ডিসেম্বর মাসের দিকে। একটা ক্রিসমাস পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল।

ততদিনে সে এইচ. আই. ভি. ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেছে। মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মিস্টার জামাল, আমরা চাই তুমি অবিলম্বে তোমার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখ সেখানে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস আছে কি না।

জামাল কয়েক বার চেষ্টা করে বলল, আমার—আমার—আমার—এইডস—

না না না, তোমার এইডস হয়েছে সেটা আমি কখনো বলি নি। তোমার রক্তে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস আছে, সেটাও আমি বলি নি। আমি বলেছি, তোমার এমন একটি মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল, যার শরীরে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস। আমরা চাই তুমি তোমার রক্ত পরীক্ষা করে দেখ, কারণ এটি সংক্রামক ব্যাধি।

আমার—আমার—এইচ. আই. ভি—

না, তোমার দেহে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস—সেটার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু যদি থাকে, তা হলে তোমার জীবনধারা পরিবর্তন করতে হবে। কারণ তখন তুমি অন্যদের আক্রান্ত করতে পার। কাজেই আমরা চাই তুমি অবিলম্বে তোমার রক্ত পরীক্ষা করাও। তোমার গোপনীয়তা রক্ষা করে তুমি কীভাবে সেটি করতে পার আমরা তোমাকে বলে দিতে পারি। আমি তোমাকে কয়েকটা টেলিফোন নাম্বার বলে দিই—

মেয়েটি শান্ত স্বরে কথা বলতে থাকে, কিন্তু জামাল কিছুই আর বুঝতে পারছে না, তার মাথায় সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। অন্যপাশে টেলিফোন রেখে দেবার পরও দীর্ঘ সময় জামাল টেলিফোনটা কানে ধরে মূর্তির মতো বসে থাকে।

জামাল ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে আসে, বড় আয়নায় নিজের উলঙ্গ দেহটিকে একটা কৃৎসিত পশুর দেহের মতো মনে হয়। এই দেহের রক্তধারায় গোপনে বাসা বেঁধেছে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস? জামাল প্রচণ্ড আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে থাকে। আচ্ছন্নের মতো কয়েক পা হেঁটে মেঝে থেকে প্যান্টটা তুলে পরে নেয়, তারপর বসার ঘরে সোফায় বসে দুই হাতে নিজের মাথা ধরে রাখে। হায় খোদা, তুমি কী করলে এটা!

জামাল কতক্ষণ এভাবে বসে ছিল জানে না, হঠাৎ লিজার গলা শুনে ঘুরে তাকায়।

জামাল। সোনা, কী হয়েছে তোমার? এখানে এভাবে বসে আছ কেন?

জামাল কিছু না বলে হতচকিতের মতো লিজার দিকে তাকিয়ে রইল। লিজা জামালের একটা ড্রেসিং গাউন পরে বের হয়ে এসেছে, কোমরে ফিতাটি বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে এসে আবার জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে তোমার?

জামাল কিছু বলল না। লিজা এগিয়ে আসে, জামালের মুখকে স্পর্শ করে বলল, কী হয়েছে জামাল?

জামাল রূঢ়ভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। লিজা আহত স্বরে বলল, জামাল, কী হয়েছে তোমার?

কিছু হয় নি। যাও তুমি।

নিশ্চয়ই কিছু—একটা হয়েছে, বল আমাকে। প্লীজ।

হঠাৎ করে জামাল চিৎকার করে বলল, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও তুমি। দূর হও।

লিজার মুখের মাঝে কেউ যেন এক পোঁচ কালি লেপে দিল মুহূর্তে। ভয়ার্ত মুখে ছুটে এসে জামালকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, জামাল! কী হয়েছে তোমার? জামাল, তুমি এরকম করছ কেন?

প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে জামাল লিজাকে মেঝেতে ফেলে দিল। ধাক্কা খেয়ে ঝনঝন করে টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ল কয়েকটা কাঁচের গ্লাস। অন্ধ আক্রোশে জামাল চিৎকার করে বলল, হারামজাদি বেশ্যা মাগী, আমার শরীর ছাড়া আর কী চাস তুই? কী চাস? কী চাস আমার কাছে?

উন্মত্ত আক্রোশে ঘুরে একটা লাথি মারে দেওয়ালে। জানালায় মাথা ঠুকে চিৎকার করতে করতে ঘুরে টেবিলে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হয়, ভাঙা কাঁচে হাত কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে, সাদা কার্পেট ছোপ ছোপ রক্তে লাল হয়ে যায় মুহূর্তে।

ভয়ংকর আতঙ্কে জামাল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রক্তধারার দিকে, এই রক্তের মাঝে কিলবিল করছে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস।

১০

তারিকের চোখ বুজে আসছিল, হঠাৎ করে মাথার মাঝে সমাধানটা উঁকি দিয়ে যায়। সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে বসে পড়ল সে। যে-সমস্যাটা সমাধান করার জন্যে সে এবং তার দলের সবাই গত তিন মাস থেকে চিন্তা করছে, তার সমাধানটা পেয়ে গেছে সে। এক্সপেরিমেন্টটার গোড়ায় একটা রিং বসাতে হবে, তার সাথে জুড়ে দিতে হবে একটা প্রি-এমপ্লিফায়ার। ব্যাস! আর কিছু লাগবে না। বড় কম্পিউটারের প্রয়োজন নেই, অফ লাইনে ডাটা অ্যানালাইসিস নেই, জটিল ইলেকট্রনিক্স নেই—নিখুঁত পরিষ্কার পরিষ্কন্ন একটি সমাধান। তারিক বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়। আর কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না। ফিজিক্যাল রিভিউতে দু'টি পেপার চলে যাবে চোখ বুজে।

তারিক কাগজে পুরোটা এঁকে দেখে। ছোট একটা হিসেব কষে নেয় নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে। প্রি-এমপ্লিফায়ারটার খসড়া ডিজাইন করে খুব খুশি হয়ে মাথা নাড়তে থাকে। কাউকে বলার ইচ্ছে করছে তার, কিন্তু কাকে বলা যায়? প্রফেসর বিলকে ডেকে তুলবে? বুড়ো মানুষ। হার্ট অ্যাটাক হবার পর থেকে স্বাস্থ্যের দিকে খুব নজর দিয়েছে। এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। ইঞ্জিনিয়ার বিল? সে আরো সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। ল্যাবেটরিতে ফোন করে দেখলে হয়, কেউ আছে কি না। তারিক ফোন করল, ফোন ধরল শ্যারন।

শ্যারন, এত রাতে তুমি কী করছ?

আন্দাজ করা তো কী করছি?

ভালো না খারাপ?

ভালো? শ্যারন হাসার ভঙ্গি করে বলল, ভালো আবার কেমন করে হবে এই ল্যাবরেটরিতে।

তাহলে খারাপ?

হ্যাঁ।

কত খারাপ?

অনেক খারাপ।

গ্যাসটা দূষিত হয়ে গেছে?

শ্যারন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, কেমন করে বুঝলে?

আমি বুঝি। এই যন্ত্রের প্রত্যেকটা জুকে আমি চিনি। আমার হাতে তৈরি তো, আমার মতোই এটা মহাবদমাইস যন্ত্র! যাই হোক, আমেকা রাত জেগে কী করবে, কাল সকালেই পরিষ্কার করো।

না, কোনো সমস্যা নেই। হোম-ওয়ার্ক ছিল কয়েকটা, বসে বসে করতে করতে চোখ রাখছি। তুমি ফোন করেছ কেন?

তারিক একগাল হেসে বলল, একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে মাথায়। একেবারে যাকে বলে সুপার আইডিয়া!

কি আইডিয়া? কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছ না—

কাল ভোরে সানডিয়াগো যাচ্ছি আমি।

ও আচ্ছা। এ. পি. এস.-এরমীটিং?

হ্যাঁ। আসতে আসতে বৃহস্পতিবার হয়ে যাবে। ভাবলাম যাবার আগে বলে যাই।

কি আইডিয়া, শুনি।

তারিক মধ্যরাত্রিতে টেলিফোনে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে শুরু করে। শ্যারন খুব উৎসাহ নিয়ে শোনে।

সানডিয়াগো থেকে তিন দিন পর তারিক ফিরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কনফারেন্সে একটু ভদ্রভাবে থাকতে হয়।

টাই না পরলেও একটা কোট পরে থাকা ভদ্রতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শুধু তাই নয়, নানা দেশের নানা বিজ্ঞানীরা আসে। তাদের কথাবার্তা আলোচনা একসময় পদার্থবিজ্ঞানে এত সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে যে, হালকা অর্থহীন কথাবার্তার জন্যে প্রাণ আইঢাই করতে থাকে। নিজের ল্যাবরেটরিতে বিবর্ণ জিনস এবং রংচংয়ে টী শার্ট পরে হাজির হয়ে তারিকের সত্যি খুব আরাম হল। প্রথমে দেখা হল জনের সাথে, বলল, কেমন হল কনফারেন্স?

ভালো।

কোনো বড় আবিষ্কারের ঘোষণা হয়েছে?

আবিষ্কার কি আর ডালভাত?

তা ঠিক। তোমার টক কেমন হয়েছে?

একরকম। এখানে কী খবর?

শ্যারন একটা দারুণ জিনিস বের করেছে।

কি জিনিস?

জন চোখ বড় বড় করে বলল, তোমার এক্সপেরিমেন্টে। একটামাত্র রিং আর প্রি-এমপ্লিফায়ার দিয়ে সব ব্যাকগ্রাউন্ড ঝেঁটিয়ে দূর করে ফেলে দেয়া হবে। দারুণ একটা আইডিয়া—

শ্যারন দিয়েছে আইডিয়াটা?

হ্যাঁ। সোমবার গ্রুপ মীটিংয়ে। জন গলা নামিয়ে বলল, মেয়েছেলের উপর ধারণাটা পাল্টে গেল। আগে ভাবতাম খালি বিছানাতেই ভালো, এখন দেখি মাথাতেও মালপানি আছে। হা হা হা।

তারিক ভ্রু কুঁচকে জনের দিকে তাকাল, শ্যারন দিয়েছে এই আইডিয়াটা?

হ্যাঁ। প্রফেসর বিল মহা খুশি। রাত্রে পার্টি আছে তাঁর বাসায়।

এই আইডিয়ার জন্যে?

হ্যাঁ।

তারিক মোটামুটি হতবুদ্ধি হয়ে নিজের অফিসের দিকে রওনা দিল। মাঝপথে ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ডের সাথে দেখা। একটা অতিকায় সার্কিট বোর্ড বগলে নিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। তারিককে দেখে থেমে জিজ্ঞেস করল, কেমন হল কনফারেন্স?

ভালো।

তোমার টক?

ভালোই। তোমার বগলে এটা কি?

ভিটো রিং। তুমি ছিলে না, গত সোমবার গ্রুপ মীটিংয়ে শ্যারন দারুণ একটা আইডিয়া দিয়েছে। একটা রিং তৈরি করে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা বের করা। সেটাই তৈরি করছি।

তৈরি হয়ে গেছে?

মোটামুটি। ডিজাইন কমপ্লিট। ওয়ার্কশপে নিয়ে যাচ্ছি, প্রোটোটাইপটা বানাব।

ও!

তারিক নিজের অফিসে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ করে নিজের চেয়ারে বসে রইল। এরকম ব্যাপারও ঘটে! দেখতে শুনতে কত চমৎকার একটা মেয়ে, অথচ কত বড় ধড়িবাজ! এই মেয়েটিকে কি চুলের ঝুঁটি ধরে রাস্তার মোড়ে একটা আছাড় দেয়া দরকার না? সে ভেবেছে এরকম একটা বদমাইশি করে পার পেয়ে যাবে? তারিক যদি

এক্ষুণি গিয়ে প্রফেসর বিলকে সত্যি কথাটা বলে, তাহলে কি এক্ষুণি এই মাকাল ফলকে কানে ধরে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে না? তারিকের নাক-মুখ দিয়ে প্রায় আগুন বের হতে শুরু করল।

তারিক উঠে দাঁড়াল, কাউকে কিছু বলার আগে শ্যারনকে খুঁজে বের করতে হবে। প্রথমে প্রফেসর বিলের অফিসে গেল, সেখানে নেই। বিল হাত তুলে বললেন, মেজর ব্রেক থ্রু হয়েছে, শুনেছ?

শুনেছি।

ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া! কি বল?

ঠিক।

তারিক শ্যারনকে খুঁজতে থাকে। ল্যাবরেটরিতে নেই, নিজের অফিসেও নেই। দুপুরে লাঞ্চের সময় দেখা পাওয়া গেল, কিন্তু তারিককে দেখে সুট করে সরে পড়ল। বিকেলে সেমিনারে শ্যারন পিছন দিকে বসে রইল, শুধু তাই নয়, সেমিনার শেষ হবার আগেই পা টিপে টিপে নিঃশব্দে হাওয়া হয়ে গেল। তারিক দাঁত কিড়মিড় করে বলল, তোমার রংবাজি আমি যদি না ছুটাই!

বিকেল বেলা তারিক পা টিপে টিপে শ্যারনের অফিসে এসে দেখে, শ্যারন টেবিলে মাথা নিচু করে কী যেন লিখছে। তারিক দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই শ্যারন ভীষণ চমকে ওঠে। তারিককে দেখে মুখটা মুহূর্তে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তারিক শক্ত গলায় বলল, তোমার সাথে কয়েকটা কথা বলতে চাই শ্যারন, তোমার সময় হবে একটু?

শ্যারন দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল, হবে।

দরজাটা বন্ধ করে দিই? শ্যারন কিছু বলার আগেই তারিক দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর ভয়ের ছবিতে খুনীরা যেভাবে অসহায় মেয়েদের খুন করার জন্যে এগিয়ে আসে, তারিক অনেকটা সেভাবে শ্যারনের দিকে এগিয়ে যায়। তারিকের নিজেকে মনে হতে থাকে কোনো হিন্দি ছবির ভিলেন। শ্যারনের টেবিলে দুই হাত রেখে মাথা নিচু করে বলল, সবাই বলছে আমাদের এক্সপেরিমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড দূর করার সাংঘাতিক একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া দিয়েছ তুমি? সুপার আইডিয়া।

শ্যারন মাথা নাড়ল।

অসম্ভব ভালো আইডিয়া। সত্যি?

শ্যারন আবার মাথা নাড়ল।

আইডিয়াটা কার?

শ্যারন দুর্বল গলায় বলল, তোমার।

তারিক হকচকিয়ে গেল। শ্যারন এত সহজে স্বীকার করবে সে কল্পনাও করে নি। কদর্য, জঘন্য, নির্মম একটা বাকবিতণ্ডার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে সে। তারিক

একটা ঢোক গিলে বলল, তা হলে সবাইকে তুমি কেন বলেছ এটা তোমার আইডিয়া?

আমি কখনো বলতে চাই নি এটা আমার নিজের আইডিয়া। গ্রুপ মীটিংয়ে আমি যখন তোমার ভিটো রিংয়ের কথাটা বলেছি, সবাই সেটা নিয়ে এত হৈচৈ শুরু করে দিল যে, আমি আর কথা বলার সুযোগই পেলাম না। সবাই ধরে নিল এটা আমি ভেবে বের করেছি। এখন—

শ্যারনের মুখটা এত দুঃখী দুঃখী হয়ে গেল যে তারিকের মায়া হতে থাকে।

তুমি ইচ্ছে করে এটা কর নি?

না। সেটা কি কেউ করতে পারে? তোমার কি মনে হয় আমি এত বড় প্রতারক?

না, তা হয় না।

আজকে প্রফেসর বিল ইয়ংয়ের বাসায় আমি বলে দেব।

কি বলবে?

বলব যে এটা তোমার আইডিয়া, আমার নয়। সবাই থাকবে, সবার সামনে বলে দেব। তোমাকে কথা দিচ্ছি। শ্যারন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা! কী লজ্জা! আমি কেমন করে এটা করলাম? শ্যারন ঠোঁট কামড়ে বসে থাকে। তারিকের ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হয় তার চোখে পানি টলটল করছে।

তারিক সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে, এই জটিল পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করতে থাকে। মাথা নেড়ে বলে, শ্যারন, তুমি একেবারে গাধার মতো একটা কাজ করেছ। এটা খুব বোকার মতো একটা কাজ হল।

আমি জানি।

জিনিসটা এমনভাবে গড়িয়েছে যে, এখন যদি তুমি সত্যি কথাটি বল তুমি খুব একটা বাজে অবস্থার মাঝে পড়বে। খুব একটা লজ্জার পরিস্থিতি।

জানি। কিন্তু দোষটা আমার, আমাকেই সামলাতে হবে। শ্যারন তারিকের দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে একটু হাসার চেষ্টা করল।

আমার মনে হয়—

কি?

আমার মনে হয় তোমার বলার প্রয়োজন নেই যে, আইডিয়াটা আমার।

শ্যারন অবাক হয়ে তারিকের দিকে তাকাল, মনে হল ঠিক বুঝতে পারছে না তারিক কী বলছে।

তারিক আবার বলল, সবাই যখন মনে করছে এটা তোমার আইডিয়া, ব্যাপারটা সেভাবেই থাকুক।

শ্যারন খানিকক্ষণ লজ্জা, অপমান, অপরাধবোধের সাথে সাথে স্বস্তি আর কৃতজ্ঞতাবোধের একটা বিচিত্র দৃষ্টিতে তারিকের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করল। তারিক দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে মেয়েটার চোখে পানি এসে যাচ্ছে।

তারিক হালকা স্বরে বলল, তোমার ব্যস্ত হবার কিছু নেই, এরপর যখন তোমার মাথা থেকে খুব ভালো একটা আইডিয়া বের হবে, সেটা আমি নিজের নামে চালিয়ে নেব।

প্রফেসর বিলের বাসায় সবাই এসেছে। তাঁর স্ত্রী বারবারা—হাসিখুশি ধরনের মহিলা, দৌড়াদৌড়ি করে খাবারের আয়োজন করছেন। বাসাটি অপূর্ব সুন্দর—চারদিকে গাছপালা, পিছনে সুইমিং পুলে নীল পানি টলটল করছে। দূরে সেন্ট গ্যাব্রিয়েল পাহাড়ের সারি। টেবিলে কাজুবাদাম এবং নানারকম পানীয় রাখা আছে। যারা মদ্যপান করে না, তাদের জন্যে আপেল সাইডারজাতীয় হালকা পানীয়। প্রফেসরের স্ত্রী বারবারার একটা কুকুর বড় একটা খেলনা কুকুরের মতো লাফঝাঁপ দিচ্ছে। কুকুরটির নাম নেপোলিয়ান, সবাই আদর করে ন্যাপি বলে ডাকছে।

গল্পগুজব করে সবাই গ্লাসে কম কিছু-না-কিছু চাখছে। মদ্যপানের কারণেই কি না বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু পরিবেশ খুব তরল। শ্যারন খুব সেজেগুজে এসেছে, দেখে চোখ ফেরানো যায় না। তার ভাবভঙ্গি খুব সহজ, কথায় কথায় হাসিতে ভেঙে পড়ছে। প্রত্যেক বার তারিকের দিকে চোখ পড়তেই অত্যন্ত মিটমিট করে অর্থপূর্ণভাবে হাসছে। সেই হাসিতে অনেকখানি কৃতজ্ঞতা, কিন্তু দেখে কেন জানি তারিকের গা জ্বলে উঠতে থাকে। শ্যারনকে কেমন জানি বেশ্যা-বেশ্যা মনে হতে থাকে।

দীর্ঘ সময় নিয়ে সবাই বসে খাওয়া হল। খাওয়ার আয়োজন বেশি নয়, তবে পরিমিত। এদের খাওয়ার ধরনটি তারিকের খুব পছন্দ। বিন্দুমাত্র অপব্যয় নেই, বিন্দুমাত্র বাহুল্য নেই। মনে হয় খাবার তৈরি করা থেকে খাবার পরিবেশন করার যত্ন নেয়া হয় বেশি। কী সুন্দর থালাবাসন, কী সুন্দর বাঁটা চাকু, কী সুন্দর ন্যাপকিন, কী সুন্দর পেয়ালা-পিরিচ। শুক কাঠের বিস্তৃত ডাইনিং টেবিলে কী সুন্দর করে সব কিছু সাজানো। খুব শখ করে খেল সবাই।

খাবারের শেষ পর্যায়ে হঠাৎ প্রফেসর বিলের স্ত্রী বারবারা বললেন, ন্যাপিকে দেখছি না কেন? ন্যাপি?

প্রফেসর বিল বললেন, আছে নিশ্চয়ই কোথাও।

আমার আশেপাশেই তো থাকে সবসময়। বারবারা উচ্চস্বরে ডাকলেন, ন্যাপি—ন্যাপিসোনা—

খেলনা পুতুলের মতো ছুটতে ছুটতে আসার কথা ছিল। কিন্তু সেটি ছুটে এল না। বারবারা উদ্বিগ্ন মুখে উঠে এলেন, এদিকে সেদিকে খুঁজলেন, উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু ন্যাপির কোনো খোঁজ নেই। যাদের খাওয়া শেষ হয়েছে তারাও উঠে এল। ঘরের ভিতরে খুঁজে না পেয়ে সবাই বাইরে বের হয়ে এল। অন্ধকার হয়ে এসেছে, বাইরে আলো নেই, টর্চলাইট হাতে সবাই বাগানে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও ন্যাপির দেখা নেই। বারবারা প্রায় কেঁদে পড়েছেন, ভাঙা গলায় বারবার বলছেন, ন্যাপি, আমার আদরের ন্যাপি—

হঠাৎ সুইমিং পুলের কাছে থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, ওটা কী? ওটা কী?

সবাই ছুটে এল, সুইমিং পুলের মাঝামাঝি বলের মতো কী যেন একটা ভাসছে। টর্চলাইটের আলোতে দেখা গেল—ন্যাপি। পানিতে ভিজে চুপসে আছে। প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই, নিশ্চল হয়ে ভাসছে।

সুইমিং পুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তুলে আনা হল। পানি খেয়ে ঢোল হয়ে আছে, বারকতক ঝাঁকুনি দেয়া হল, তখন দুর্বলভাবে চোখ খুলে একটা বিচ্ছিরি দিল ন্যাপি।

বেঁচে আছে! বেঁচে আছে! বেঁচে আছে এখনো—বারবারা চিৎকার করে বললেন, হাসপাতালে চল, হাসপাতালে—

ন্যাপিকে একটা টাওয়েলে জড়িয়ে প্রফেসর বিল তখন তখনি হাসপাতালে ছুটলেন। তাঁদের বাসার কাছেই নাকি একটা পশু হাসপাতাল আছে। তারিক জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল, প্রফেসর বিল এবং তাঁর স্ত্রী বারবারা ন্যাপিকে বুকে জড়িয়ে গাড়ি করে বের হয়ে যাচ্ছেন। একটি ছোট অসহায় পশুর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টার মাঝে নিশ্চয়ই একটা মানবিক দিক রয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি কারণে তারিক কেন জানি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

জানালার কাছে তারিকের পাশে ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড এসে দাঁড়াল। বলল, তোমার দেশের ঘূর্ণিঝড়ের আর কিছু খবর পেলে?

তারিক চমকে উঠে বলল, ঘূর্ণিঝড়? কি ঘূর্ণিঝড়?

ও, তুমি জান না?

না। আমি এ. পি. এস. মীটিংয়ে সানডিয়াগো গিয়েছিলাম। গত তিন দিন কোনো খবর শুনি নি। কি হয়েছে?

খুব খারাপ একটা ঘূর্ণিঝড় হয়েছে শুনেছি। বেশ নাকি মানুষ মারা গিয়েছে।

কত মানুষ?

সি. এন. এনে তো বলল, তিন শ' হাজার। কিন্তু ভুল বলেছে নিশ্চয়ই। তিন শ' হাজার তো হতে পারে না। হতে পারে?

তারিক বিবর্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলল, পারে।

হঠাৎ করে তার কেমন জানি বমি বমি লাগতে থাকে।

১১

গ্রে-হাউন্ড বাস স্টপ জায়গাটি ভালো নয়। চালচুলোহীন মানুষেরা এখানে এসে ভিড় জমায়। খবরের কাগজে মুড়ে বোতল থেকে সস্তা মদ খায়। একে অন্যের সঙ্গে মুখ খিস্তি করে। বাস স্টপের এক কোণায় মেঝেতে পা মুড়ে তিন জন মানুষ বসে আছে। একজন শ্বেতকায় মধ্যবয়সী মানুষ, মুখে নোংরা দাড়িগোঁফের জঙ্গল। দ্বিতীয় জন

একটি কালো মানুষ, মাথার কাছে দগদগে ঘা লাল হয়ে ফুলে আছে। তৃতীয় নয়ন জামাল— খুব ভালো করে লক্ষ না করলে তাকে চেনা যায় না। গায়ের কাপড় ময়লা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ রক্তবর্ণ, সেই চোখে একধরনের বোবা আতঙ্ক। একটা হাত সামনে রেখে সে একদৃষ্টে তার হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। হাতের শিরা মোটা হয়ে ফুলে আছে। এই শিরার ভিতর দিয়ে কুলকুল করে রক্ত বইছে, সেই রক্তে হয়তো বংশবৃদ্ধি করছে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস। ভয়ংকর এইচ. আই. ভি. ভাইরাস। জামালের শরীর শিউরে ওঠে থেকে থেকে।

জামাল একবার বাস স্টপের দিকে তাকাল। গ্রে-হাউন্ডের একজন কর্মচারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। সম্ভবত আবার তাদের বের করে দেবে। তখন সে কোথায় যাবে কে জানে। শহরের মাঝামাঝি হতচ্ছাড়া ধরনের একটা পার্ক আছে, সেখানে সে যেতে পারে। খালি একটা বেঞ্চ পেলে শুয়ে থাকবে সেখানে। কিংবা কাস্ট ইন্টারস্টেট ব্যাংকের পার্কিং লটে যেতে পারে। মাটির নিচে অন্ধকার পার্কিং লটের এক কোণায় সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে।

পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়ে যাবে সেটাই তার ভয়। মাঝে মাঝে মনে হয় পরিচিত কেউ আসছে, তখন সে দুই হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে বসে থাকে। লুকিয়ে থাকতে হবে তাকে, অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে হবে, মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে থাকতে হবে মাথা নিচু করে। তাকে দেখলেই নিশ্চয়ই সবাই ছিটকে সরে যাবে ভয়ে। তার শরীরে নিশ্চয়ই আছে ভয়ংকর এইচ. আই. ভি.। এই শরীরটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে সব ভাইরাসকে নিয়ে। কেমন করে করবে সে! সে তো ভীতু! সাহসী হলে এতদিনে লাফিয়ে পড়ত একটা বাইশচাকার ট্রাকের নিচে। সেটার সাহস নেই, তাই সে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে। প্রথম প্রথম কিছু একটা ভাবত, আজকাল আর কিছু ভাবে না। মাথার ভিতরে কেমন যেন এক ধরনের শূন্যতা। ছাড়া ছাড়া ভাবে মাঝে মাঝে কিছু-একটা মনে হয়, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই ভয়াবহ শূন্যতা।

তারিকের অফিসে ন্যান্সি এসেছে দেখা করতে। ফোন করে এসেছে, খুব নাকি জরুরি একটা ব্যাপার। মেয়েটিকে দেখেছিল জামালের সাথে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের কথা যখন জানতে এসেছিল জামাল, তখন। তারিক ঠিক বুঝতে পারল না কী জরুরি ব্যাপার হতে পারে।

ন্যান্সি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, তোমার কাছে আমি একটা জিনিস জানতে এসেছি।

কি জিনিস?

তুমি কি জান জামালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কী বলছ তুমি!

হ্যাঁ।

কী হয়েছে?

কেউ ঠিক বলতে পারে না। ন্যান্সি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, হঠাৎ করে মাথা-খারাপের মতো হয়ে গেছে।

মাথা খারাপ? তারিক অবাক হয়ে বলল, মাথা খারাপ?

হ্যাঁ। কাজ ছেড়ে দিয়েছে। বাসায় ফিরে যায় না, রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়।

জামাল?

হ্যাঁ, জামাল। ন্যান্সি মেয়েটির চোখ ছলছল করে ওঠে, তুমি কি দেখেছ তাকে?

না, দেখি নি। তারিক তখনো ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি।

আমি যে ওকে কতদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কী হয়েছে ওর? কোথায় আছে? তুমি কিছু জান না?

না।

তুমি তো ওর বন্ধু। তুমি ওকে খুঁজে দেবে, প্লীজ? ওর কোনো-একটা খবর পেলে আমাকে জানাবে?

জানাব। নিশ্চয়ই জানাব।

আহা, আমার জামাল! না জানি কি কষ্টের মাঝে আছে!

ন্যান্সি হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

তারিক কী বলবে বুঝতে পারে না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, তুমি এত ঘাবড়ে যেও না ন্যান্সি। আমি খোঁজ নেব। খোঁজ নিয়ে তোমাকে জানাব।

জানাবে? সত্যি? প্লীজ!

হ্যাঁ। এখানে অনেক বাঙালি আছে, তাদের কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই এর খোঁজ জানে।

জানে? ন্যান্সি হঠাৎ উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠে ব্যাকুল হয়ে বলে, তুমি ফোন কর। প্লীজ তুমি ফোন কর। এক্ষুণি—

এক্ষুণি?

হ্যাঁ।

তারিক টেলিফোন নাম্বার বের করে ফরিদকে টেলিফোন করল। ফরিদ জামালের মাথা-খারাপ হওয়ার খবরটি বেশ ভালোভাবে জানে। তারিক যে এখনো জানে না, সেটা শুনে সে বেশ অবাকই হল। ফরিদ বলল, জামালকে মাঝে মাঝে নাকি রাস্তাঘাটে দেখা যায়। জামালের সবচেয়ে ভালো খোঁজ নাকি দিতে পারবে মণ্ডল নামের একজন ভদ্রলোক, তার বাসা আর জামালের অ্যাপার্টমেন্টটি বেশ কাছাকাছি। ফরিদ তারিককে মণ্ডল সাহেবের টেলিফোন নাম্বার দিল। তাঁকে বাসায় পাওয়া গেল না, তাঁর স্ত্রী অফিসের নাম্বার দিলেন। অফিসে ফোন করে সত্যি সত্যি জামালের খোঁজ পাওয়া গেল— সে নাকি বেশির ভাগ সময় গ্রে-হাউন্ড বাস স্টপে বসে থাকে। কাউকে চেনে না, কারো সাথে কথা বলে না, বদ্ধ পাগল। মণ্ডল সাহেব খবরটি দিতে গিয়ে আনন্দে হেসে ফেললেন।

ন্যান্সি সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল, তারিকের দু' হাত জাপটে ধরে বলল, তুমি যাবে আমার সাথে? প্লীজ! যাবে? তারিক, ও আমাকে দু' চোখে দেখতে পারে না।

তারিক অবাক হয়ে ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে থাকে। এই হচ্ছে ভালবাসা? রমণীর ভালবাসা? যে-ভালবাসার জন্যে সে বুভুক্ষের মতো অপেক্ষা করে আছে আর জামাল দু' পায়ে দলে দিচ্ছে অবলীলায়।

জামাল।

কে ডাকছে তাকে? জামাল চোখ খুলে তাকাল না, কুঁকড়ে মাথা ঢেকে ফেলল হাঁটুর নিচে।

জামাল— আমি ন্যান্সি। এই দেখ।

জামাল তবু মাথা তুলল না। পুতিগন্ধময় নোংরা জায়গা, ন্যান্সি তার মাঝে হাঁটু গেড়ে বসে জামালকে জড়িয়ে ধরে বলল, জামাল আমার জামাল, তুমি চোখ খুলে দেখ একবার, চোখ খুলে দেখ।

জামাল পিটপিট করে তাকাল একবার। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল ন্যান্সিকে, কিন্তু কতদিন থেকে সে অর্ধাহারে অনাহারে আছে, গায়ে জোর নেই বিন্দুমাত্র। ন্যান্সি তাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, নোংরা চোখ মুখ গালে মুখ ঘষে চুমু খেতে খেতে বলল, আমার জামাল, সোনামানিক আমার, ভালবাসার ধন, তুমি কেন এমন করছ? তুমি কেন এমন করছ?

জামাল নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, আমাকে ছুঁয়ো না। চলে যাও— চলে যাও—

কেন সোনামানিক? কেন চলে যাব আমি?

সর্বনাশ হয়ে যাবে! চলে যাও।

কেন সর্বনাশ হবে? কী সর্বনাশ?

জামাল কোনো কথা না বলে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ন্যান্সি আবার তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, বল। কথা বল।

সানফ্রান্সিসকো থেকে আমাকে ফোন করেছে।

কে ফোন করেছে?

জানি না।

কেন ফোন করেছে?

বলেছে আমার রক্তে মনে হয় এইচ. আই. ভি. ভাইরাস আছে।

এইচ. আই. ভি.?

হ্যাঁ! বলেছে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখতে।

দেখেছ!

না।

কেন?

ভয় করে। আমার খুব ভয় করে। জামাল হঠাৎ একটা শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করে, কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বলে, আমার রক্তের মাঝে এইচ. আই. ভি.— আমার রক্তের মাঝে— এইচ. আই. ভি.। আমার ভয়— প্রচণ্ড ভয়—

ন্যান্সি জামালকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার কোনো ভয় নেই সোনামানিক। কোন ভয় নেই। আমি আছি তোমার সাথে।

আমাকে ছুঁয়ো না। তোমারও এইডস হয়ে যাবে।

ন্যান্সি গভীর ভালবাসায় জামালকে বুকে চেপে ধরে বলে, হোক। তোমার যদি হয় আমারও হবে।

জামাল অবাক হয়ে ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে থাকে। মস্তিষ্কে যে বিশাল শূন্যতা ছিল; সেটা যেন ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে। সেই শূন্যতা যেন পরিপূর্ণ হচ্ছে শৈশবের স্মৃতিতে, কৈশোরের স্মৃতিতে, যৌবনের স্মৃতিতে, ভালবাসার স্মৃতিতে। কতদিন সে ঘুমায় নি, হঠাৎ গভীর ঘুমে তার চোখ বুজে আসতে থাকে। ন্যান্সির কাঁধে মাথা রেখে জামাল চোখ বুজল।

ন্যান্সি মাথা ঘুরিয়ে তারিককে ডেকে বলল, একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে, প্লীজ? হাসপাতালে নিতে হবে জামালকে। এক্ষুণি।

১২

ফরিদ টেবিলে মাথা রেখে বসে আছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, ভিতরে কোথায় জানি একটা শিরা দপদপ করছে, মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে যাবে আর নাক-মুখ দিয়ে উষ্ণ রক্ত গলগল করে বের হয়ে আসবে। তার ভাইয়ের যেরকম হয়েছিল। যে-দৃশ্যটা সে প্রায়ই দেখে।

তার পাঁচ ভাই দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কেমন জানি বিহ্বল একটা দৃষ্টি। যেন বুঝতে পারছে না কী হবে। হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পাকিস্তানি মিলিটারি জোয়ান। কমবয়সী একজন মানুষ। টকটকে গায়ের রং, মুখে একটা সিগারেট চেপে ধরা। হাতে কী চমৎকার একটা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল! কার সাথে যেন উচ্চস্বরে একটা কথা বলল, তারপর সিগারেট মুখে চেপে রেখেই কী আশ্চর্য সহজভাবে গুলি করে দিল। বড় ভাইয়ের মাথার একটা অংশ উড়ে গেল হঠাৎ করে। মেজো ভাই দুই হাত সামনে এগিয়ে দিল, যেন বুলেটগুলি থামানোর চেষ্টা করছে হাত দিয়ে।

ফরিদ টেবিলে মাথা ঠুকল কয়েক বার। অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়, আহা, যদি কিছু-একটা করতে পারত সে! গলা শুকিয়ে গেছে, গ্লাসটা তুলে দেখে খালি। বাথরুমে গিয়ে ট্যাপ খুলে পানি ঢেলে ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নেয় সে, সাথে সাথে

কেমন জানি বমি বমি লাগতে থাকে তার।

ফরিদ আয়নায় নিজের দিকে তাকাল, চোখ দু'টি টকটকে লাল। ঠোঁটগুলি শুকনো, অনেকটা কালচে হয়ে আছে। চুলগুলি দুই হাতে এতবার টেনেছে যে, মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে। ফরিদের নিজের কাছেই নিজের চেহারা কেমন জানি অচেনা মনে হয়। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে নিজের দিকে, আর কেমন জানি বিজাতীয় অসহ্য একটা ক্রোধ ভিতরে মাঝে পাক খেতে থাকে। মনে হয় নিজের টুঁটি নিজে চেপে ধরে মাথাটা দেয়ালের মাঝে ঠুকতে থাকে, যতক্ষণ-না সবকিছু থেঁতলে একটা অর্থহীন রক্তমাংসমজ্জাপিণ্ডে পাল্টে যায়। ফরিদ আয়না থেকে তার হিংস্র চোখ সরিয়ে নিয়ে টলতে টলতে বসার ঘরে এসে সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। মনে হচ্ছে মাথাটা ছিঁড়ে দেহ থেকে ছিটকে আলাদা হয়ে পড়বে।

ভাসা ভাসা আবার একটা দৃশ্য ভেসে আসে চোখের সামনে। খাটের নিচে লুকিয়ে আছে ছোট ভাই কমল। পাকিস্তানি মিলিটারির একজন জোয়ান চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে টেনে বের করে আনছে। কী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কমল ভাই, যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না পুরো ব্যাপারটা। গুলি করে যখন তাকে মেরে ফেলেছে, তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কমল ভাই। মানুষ মরে গেলে নাকি চোখ বন্ধ করে দিতে হয়। কেউ চোখ বন্ধ করে নি কমল ভাইয়ের, তাই মরে গিয়েও কমল ভাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ফরিদ যখন তাকাল কমল ভাইয়ের দিকে, দেখল স্থির বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে কমল ভাই মরে গিয়েও তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ বন্ধ করে ফরিদ এখনও দেখতে পায় কমল ভাই অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকিয়ে আছে, অবাক হয়ে, ভীষণ অবাক হয়ে—

ফরিদ নিজের চুল ধরে মাথা ঝাঁকায় কয়েক বার, ফিসফিস করে বলে, আর তো সহ্য হয় না খোদা—আর তো সহ্য হয় না— সহ্য হয় না— সহ্য হয় না—

সোফা থেকে উঠে বসে, পকেট হাতড়ে আরো দু'টি ট্যাবলেট বের করে। কোডিন দেয়া টাইলেনল। চার ঘন্টায় দু'টির বেশি খাওয়ার কথা নয়, সে ইতোমধ্যে চারটি খেয়েছে, আরো দু'টি খেয়ে দেখবে এখন।

মায়ের কথা মনে পড়ল হঠাৎ। পাঁচ ভাইয়ের পাঁচটি শরীর পাশাপাশি মেঝেতে শুয়ে আছে। শরীরের রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। মা মাথার কাছে চুপ করে বসে আছেন। তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে। কিছু নেই সেই দেয়ালে, ধবধবে সাদা দেয়াল, একটা ছবিও নেই। মা অবাক হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে সেই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে তাঁর একটা ছেলের দিকে তাকান, কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেন, শার্টের কলারটা সোজা করে দেন, তারপর আবার দেয়ালের দিকে তাকান। মুখে দুঃখের কোনো চিহ্ন নেই। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলেন, মনে হয় হঠাৎ করে শুকনো মরুভূমির উপর হা-হা করে জ্বলন্ত বাতাস ছুটে আসে পৃথিবীকে ছারখার করে দেবার জন্যে। ফরিদের মাথার ভিতর সেই ভয়ংকর সর্বনাশা দীর্ঘশ্বাস ঘুরপাক খেতে থাকে— ঘুরপাক খেতে থাকে। আহ্! কী যন্ত্রণা! কী কষ্ট!

ফরিদ উঠে দাঁড়ায়, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। গাড়ি যাচ্ছে শব্দ করে। পিছনের লাল বাতি দু'টি যেন একজন মানুষের ক্রুদ্ধ এক জোড়া চোখ, প্রচণ্ড আক্রোশে যেন তাকে বলছে, ধ্বংস হ! ধ্বংস হ!

ফরিদ থরথর করে কাঁপতে থাকে। তার আর কোনো উপায় নেই। তাকে বের হতে হবে। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে সানসেট বুলেভার্ড দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে ডায়মন্ডের উপর দিয়ে। ট্রাফিক লাইট তখন থাকবে লাল। উল্টোদিক দিয়ে তখন ছুটে আসবে গাড়ি। তার মাঝে দিয়ে সে বের হয়ে যাবে ষাট-সত্তুর-আশি মাইল স্পীডে। দুই পাশে থাকবে উজ্জ্বল শহর, ঝকঝকে নিয়নবাতি, মানুষের ভিড়, রঙিন গাড়ি— তার মাঝে ছুটে যাবে সে গুলির মতো। সবকিছু ঝাপসা হয়ে যাবে চারপাশে। শুধু একটা লাল বিন্দুর মতো ট্রাফিক লাইট জ্বলজ্বল করতে থাকবে সামনে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছুটে যাবে সে। তীক্ষ্ণ হর্নে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে, প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক করবে, তাল হারানো গাড়ি, টায়ার পোড়া ধোঁয়ায় ঢেকে যাবে চারদিক, ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে যাবে আর তার মাঝে দিয়ে ছুটে বের হয়ে যাবে সে। হয়তো বের হয়ে যাবে, হয়তো যাবে না। হয়তো প্রচণ্ড আঘাতে গাড়ি ছিটকে পড়বে এক পাশে। বিস্ফোরণে ফেটে যাবে গ্যাসট্যাংক, দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে গাড়ি—

ফরিদ থরথর করে কাঁপতে থাকে। প্রচণ্ড জ্বরে বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো সে হাতড়ে হাতড়ে নিচে নামতে থাকে। কোনো কিছু নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার আর ক্ষমতা নেই ফরিদের। মাথার মাঝে শুধু একটি জিনিস। ট্রাফিকের লাল সিগনাল জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আর এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে সে গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে তুলছে ষাট থেকে সত্তুরে, সত্তুর থেকে আশি, আশি থেকে নব্বই—

সানসেট বুলেভার্ড দিয়ে গাড়ি ছুটে যেতে থাকে। এক্সেলেটরে চাপ দেয় ফরিদ। গাড়ির গতিবেগ বাড়তে থাকে। ষাট থেকে সত্তুর। সত্তুর থেকে আশি। ছায়ার মতো সরে যাচ্ছে সবকিছু। সামনে শুধু লাল বিন্দুর মতো ট্রাফিক লাইট। দুই পাশ থেকে ঝড়ের মতো ছুটে যাচ্ছে গাড়ি, তার মাঝে দিয়ে বের হয়ে যাবে সে। প্রচণ্ড হর্ন শুনতে পায় ফরিদ। গাড়িগুলি সরে যেতে চেষ্টা করছে। তাল হারিয়ে ছিটকে পড়ছে দু' পাশে। পুলিশের সাইরেন তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে ওঠে হঠাৎ। তীব্র আলোর ঝলকানি চোখ ধাঁধিয়ে দিল, প্রচণ্ড শব্দ—কান-ফাটানো বিস্ফোরণ।

প্রচণ্ড আঘাতে সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল হঠাৎ।

অনেকক্ষণ থেকে টেলিফোনটা বেজে যাচ্ছে। টেলিফোনটা রাতে মাথার কাছে রাখা হয় নি। তারিক আধঘুমে উঠে হাতড়ে হাতড়ে টেলিফোনটা ধরল। এত রাতে কে টেলিফোন করেছে?

হ্যালো।

আমি হলিউড পুলিশ স্টেশন থেকে বলছি।

তারিকের ঘুম চটে গেল সাথে সাথে। বলল, কেন, কী হয়েছে?

তুমি কি তারিক?

হ্যাঁ।

তুমি কি ফরিদ নামে কাউকে চেন?

চিনি। কেন, কী হয়েছে?

পুলিশ উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ তারিক বুঝে গেল কী হয়েছে। খুব সাবধানে সে দেওয়ালটা ধরে আস্তে আস্তে মেঝের উপর বসে।

ফরিদ। এটা তুমি কী করলে ফরিদ।

দেশের মসজিদে মেয়েরা আসে না, এখানে আসে। পিছন দিকে খানিকটা জায়গা মেয়েদের জন্যে আলাদা করে রাখা আছে।

অনেক মেয়ে এসেছে। শাড়ি পেঁচিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে বলে দেখতে তাদের কেমন জানি অন্যরকম লাগছে আজ। পরিচিত অপরিচিত প্রায় সবাই এসেছে। জামালও এসেছে ন্যান্সিকে নিয়ে। ন্যান্সি একটা কালো শাড়ি পরে এসেছে। শোকের প্রতীক কালো পোশাকে যে একজন মানুষকে এত সুন্দর দেখাতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

তারিক একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে। তার এক পাশে আমজাদ সাহেব, অন্য পাশে একজন অপরিচিত মানুষ। সামনে মসজিদের মাঝামাঝি এক জায়গায় ফরিদের মৃতদেহ সাদা কাপড়ে ঢাকা। তার জানাজার ব্যবস্থা চলছে। আশরাফ ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে, কথা বলছে, মৃত্যুর পরও কিছুই থেমে থাকে না।

মিলিকে দেখা গেল হঠাৎ। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে, চোখ দুটি লাল, মনে হয় কেঁদেছে খানিকক্ষণ। মিলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এক কোণায়, হঠাৎ পেশীবহুল একজন মানুষ এগিয়ে গেল মিলির দিকে, ইংরেজিতে বলল, সিস্টার, মাথায় কাপড় দাও।

মিলি হকচকিয়ে গিয়ে মাথায় কাপড় তুলে দিল।

মানুষটি আবার বলল, মুসলমান মেয়েদের মাথা ঢেকে রাখতে হয়।

জানাজা পড়ার জন্যে সবাই সারি বেধে দাঁড়িয়েছে। তারিকও উঠে দাঁড়াল, শেষের দিকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষগুলিকে লক্ষ করতে থাকে, এখানে বাঙালি ছাড়া অন্য দেশের মানুষও আছে। কিছু মধ্যপ্রাচ্যের, কিছু ভারতবর্ষের— মনে হল কিছু পাকিস্তানেরও আছে। পাকিস্তানের? তারিক ভুরু কুঁচকে পাশে দাঁড়ানো মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, এখানকার অবাঙালি মানুষগুলি কোন দেশি?

পাকিস্তানি। বেশির ভাগ পাকিস্তানি।

পাকিস্তানি?

জ্বি। ইমাম সাহেবও পাকিস্তানি। বুজুর্গ মানুষ।

তারিক হঠাৎ ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে যায়। ফরিদের জানাজায় পাকিস্তানি মানুষ— এটা তো হতে পারে না।

লোকজন সারি বেধে দাঁড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানি ইমাম সাহেব জানাজা পড়ানোর জন্যে নিয়ত প্রায় বেঁধে ফেলেছেন, তারিক হাত তুলে তাঁকে থামাল। উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, জানাজা শুরু করার আগে আমার একটি খুব জরুরি কথা বলতে হবে। খুব জরুরি।

কী বলবে শোনার জন্যে সবাই কৌতূহলী চোখে তাকায়। তারিক গলা উঁচু করে বলল, একাত্তর সালে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ফরিদের পাঁচ ভাইকে একসাথে গুলি করে মেরেছিল। পাঁচ ভাইকে। একসাথে।

উপস্থিত অনেকে, বিশেষ করে যারা পাকিস্তানের, তারা ভুরু কুঁচকে তাকাল। তারিক বলল, ফরিদ সেজন্যে কখনো পাকিস্তানের মানুষকে ক্ষমা করে নি। ফরিদ পাকিস্তানের মানুষকে এত ঘেন্না করত যে এদেশে কখনো ঈদের জামাতে নামাজ পর্যন্ত পড়তে যায় নি। কারণ তা হলে হয়তো পাকিস্তানির সাথে কোলাকুলি করতে হবে।

উপস্থিত বেশ কিছু মানুষ হঠাৎ করে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কেউ কেউ প্রতিবাদ করে কিছু-একটা বলতে চাইছিল, তারিক গলা উঁচিয়ে বলল, আমি ফরিদের জানাজায় কোনো পাকিস্তানিকে দাঁড়াতে দেব না। যারা পাকিস্তানি, তারা অনুগ্রহ করে সরে যান।

উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারিক আবার গলা উঁচিয়ে বলল, পাকিস্তানিরা সরে যান।

পেশীবহুল মানুষটি, যে একটু আগে মিলিকে মাথায় কাপড় দেয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, সে পাকিস্তানি মানুষের বিশেষ ইংরেজি উচ্চারণে বলল, এটা খোদার ঘর। এখানে পাকিস্তানি বোংলাদেশ নাই। সবাই ভাই ভাই—

তারিক বলল, শব্দটা বোংলাদেশ না, বাংলাদেশ। আর তোমার কাছে হয়তো পাকিস্তান বাংলাদেশ নেই, কিন্তু যার জানাজা পড়ানোর জন্যে এখানে এসেছ, তার কাছে ছিল। পাঁচ ভাইকে তার চোখের সামনে পাকিস্তানিরা গুলি করে মেরেছিল। পাঁচ ভাইকে। সেই থেকে তার মাথার মাঝে একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। সে মারা গেছে এ জন্যেই। পাকিস্তানিরা তার পাঁচ ভাইকে মারে নি, ছয় ভাইকে মেরেছে। ছয় ভাইকে।

ব্রাদার। আল্লাহ্‌র ঘরে পলিটিক্স হয় না।

মানুষ মারা পলিটিক্স না, মানুষ মারা মার্ডার। সেটা নিয়ে আমি তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই না। তুমি যদি পাকিস্তানি হও, সরে যাও। আমি এখন তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না।

তোমার হুকুম?

হ্যাঁ, আমার হুকুম। এই ডেডবডি পুলিশের কাছ থেকে আমি বুঝে নিয়েছি। এর দায়-দায়িত্ব আমার। আমি বলছি পাকিস্তানিরা সরে যাও। যদি তোমরা না সর, এই

ডেডবডি আমি সরিয়ে নিয়ে যাব। দরকার হলে আমি আমার বাড়ি নিয়ে জানাজা পড়াব, কিন্তু কোনো পাকিস্তানিকে আমি তার জানাজায় থাকতে দেব না। এই মানুষটির জীবন তোমরা শেষ করেছ, শেষ সময়ে তার আত্মাকে কষ্ট দিও না।

তারিক ফরিদের মৃতদেহকে সামনে নিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বলল, সব পাকিস্তানি সরে যাও।

ধীরে ধীরে জানালায় দাঁড়ানো মানুষজনের মাঝে থেকে বেশ কিছু মানুষ মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল।

ফরিদের জানাজা পড়ালেন আমজাদ সাহেব।

১৩

চতুষ্কোণ ছোট কার্ডটি দরজায় প্রবেশ করাতেই খুট করে ছিটকিনি খুলে গেল। তারিক ভিতরে ঢুকে হাতের ছোট ব্যাগটি চেয়ারের উপর রেখে জানালার দিকে এগিয়ে যায়। পর্দা টেনে দিতেই সে মুগ্ধ হয়ে গেল, কী সুন্দর বাইরে। নীল হ্রদ, হ্রদের তীরে সারি সারি সেলবোট, দূরে হালকা নীল রংয়ের পাহাড়ের ছায়া— অপূর্ব একটা দৃশ্য। ক্যালেন্ডারেই শুধু এরকম দৃশ্য দেখা যায়। কাল রাতে যখন হোটেলে এসেছিল, তখন বাইরে অন্ধকার নেমে গেছে, তখনো আলো ফোটে নি। বিকেলের পড়ন্ত আলোতে প্রথম বার এই অসাধারণ দৃশ্যটি দেখে সে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গ্লেন লিভিংস্টোনের আমন্ত্রণে সে দু'দিনের জন্যে এই এলাকায় এসেছে। আজকের দিনটি কাজকর্মে কেটেছে, কাল কোনো কাজ নেই, গ্লেন তাকে এই এলাকাটি ঘুরিয়ে দেখাবে। তারা খুব চাইছে তারিক এখানে যোগ দেয়, তাকে মুগ্ধ করানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা হচ্ছে। তাকে রাখার জন্য এই হোটেলটি বেছে নেয়াও হয়তো তাকে মুগ্ধ করানোর একটা সুক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

তারিক গলা থেকে টাইটা খুলতে খুলতে ভিতরে ঢুকল। বিশাল বিছানাটি গুছিয়ে দিয়ে গেছে, টেবিলে ছড়ানো-ছিটানো কাগজে হাত দেয় নি, কিন্তু অন্য সব কিছু তকতকে ঝকঝকে। বড় হোটেলের সবকিছুতেই কেমন যেন ঐশ্বর্যের চিহ্ন। তারিক রিমোট কন্ট্রোলটি দিয়ে টেলিভিশনটি চালিয়ে দিয়ে গদিআঁটা নরম চেয়ারটিতে আরাম করে বসে। গাড়ির একটা বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে, তার নিজের বাসায় ছোট সস্তা টেলিভিশনটিতে এই বিজ্ঞাপনটি কী কুৎসিতই না দেখায়। গাড়ির রংটি দেখায় ক্যাটক্যাটে বেগুনি অথচ এখানে চোখ জুড়ানো একটা মেরুন রং। তারিক মুগ্ধ হয়ে দেখল। গাড়ির বিজ্ঞাপনের পর হল কর্ন ফ্লেক্সের বিজ্ঞাপন। যে-মানুষটি কর্ন ফ্লেক্স খাচ্ছে তাকে তার টেলিভিশনে একটা নির্বোধের মতো মনে হয়, অথচ এখানে দেখাচ্ছে রীতিমতো একজন ভদ্রলোক। ব্যাপারটি কেমন করে হয় কে জানে।

তারিক খানিকক্ষণ টেলিভিশনের সামনে বসে থেকে উঠে দাঁড়াল। আজ রাতে আর কোনো কাজ নেই। গোসল, খাওয়া সেরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা ভালো বই

নিয়ে বসে থাকবে বিলাসী মানুষের মতো।

ঝকঝকে বাথরুমে দীর্ঘ সময় উষ্ণ পানিতে গোসল করে ধবধবে সাদা টাওয়েল জড়িয়ে তারিক বের হয়ে আসে। এর মাঝে বেশ খিদে লেগে গেছে। লস এঞ্জেলাস সময় অনুযায়ী এখন অপরাহ্ণ, খিদে লাগার কথা নয়। কিন্তু সারাদিনের ব্যস্ততার পর গোসল করে সতেজ হয়ে নেয়ার সাথে সাথে শরীরটি একপেট খাবারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে বলে মনে হল।

ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে তারিক নির্মমভাবে নিজের চুল মুছতে মুছতে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে থাকে। টেলিভিশনে একটি সূর্যাস্ত দেখানো হচ্ছে। গলা কাঁপিয়ে প্রতিবেদক বলছে, এটা হচ্ছে বছরের শেষ সূর্যাস্ত, কাল যখন নূতন সূর্য উঠবে, সেই সূর্য বয়ে আনবে একটি নূতন বছর। তারিকের হঠাৎ মনে পড়ল আজ বছরের শেষ দিন, ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ।

কাপড় পরতে পরতে আবার টেলিভিশনের সামনে দাঁড়ায় তারিক। বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নিয়ে একটি ছোট অনুষ্ঠান করেছে, নাম দিয়েছে ভিডিও মন্তাজ। একটির পর একটি দৃশ্য দেখিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। প্রথমে দেখাল বিজ্ঞানের দৃশ্য, শত্রুর উপর বিজয়, রোগ শোক জরা ব্যাধির উপর বিজয়। তারপর দেখাল রাজনৈতিক ঘটনাবলী, সবার শেষে মানুষের দুঃখকষ্টের দৃশ্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্য। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষকে দেখাল, তুরস্কের ভূমিকম্পে হতাহতদের দেখাল, গৃহহীন কুর্দি মানুষকে প্রাণভয়ে ছুটে যেতে দেখাল, আফ্রিকার অনাহারী মানুষদেরদেখাল—

তারিক হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলে। এখন নিশ্চয়ই দেখাবে বাংলাদেশের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, প্রলয়ঙ্করি জলোচ্ছ্বাস। নিশ্চয়ই দেখাবে সেই ভয়ংকর দৃশ্যটি, যেখানে সমুদ্রের উপকূলে সারি সারি পড়ে আছে মানুষ আর পশু— মৃত্যু যেখানে মানুষ আর পশুকে নিয়ে এসেছে একসারিতে। সেটি দেখানোর সময় নিশ্চয়ই আবার সবাইকে মনে করিয়ে দেবে, এই দেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ, এই দেশে মানুষের কোনো আশা নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তারিক সারা শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে টেলিভিশনের সামনে।

কিন্তু সেটি দেখাল না, ভিডিও মন্তাজ শেষ করে পারফিউমের একটি বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু হয়ে গেল।

তারিক পিছিয়ে এসে বিছানায় বসে। বাংলাদেশে একরাতে তিন লক্ষ মানুষের মরে যাওয়াটি পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি নয়। তিন লক্ষ মানুষ। তিন লক্ষ মানুষ।

তারিকের মাথার মাঝে অন্ধ রাগ ফুঁসে উঠতে থাকে। ভয়ংকর অন্ধ রাগ। সে হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলে নেয়, তাকে বের করতে হবে কেমন করে এটা ঘটতে পারে। টেলিফোন ডায়াল করার সময় সে লক্ষ করে তার হাত অল্প অল্প কাঁপছে।

ভোরবেলা গ্লেন লিভিংস্টোন এসে হাজির। আজ বছরের প্রথম দিন। সবকিছু ছুটি।

তারিকের সাথে সেভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ছুটির দিনে তারিককে এই এলাকাটি ঘুরিয়ে দেখাবে। নিউ ইয়র্ক স্টেটের এই উত্তরাঞ্চল এলাকাটি অপূর্ব সুন্দর, গ্লেনের খুব উৎসাহ সে কারণে।

তারিক গ্লেনকে বলল, গ্লেন, আমাদের পরিকল্পনা একটু পরিবর্তন করতে হবে।

কি পরিবর্তন?

আমাকে একটু নিউ ইয়র্ক শহরে যেতে হবে।

গ্লেন চোখ কপালে তুলে বলল, নিউ ইয়র্ক শহরে?

হ্যাঁ।

সেখানে কোথায়?

তারিক একটু ইতস্তত করে বলল, এ. বি. সি. টেলিভিশন স্টেশনে।

টেলিভিশন স্টেশনে? শো বিজনেসে নেমে যাচ্ছ নাকি?

তারিক একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, একজন মানুষের সাথে দেখা করতে হবে।

হঠাৎ করে?

হ্যাঁ, হঠাৎ করে। কাল রাতে একটা ব্যাপার হল, তারপর। হঠাৎ করেই হল। একজন প্রডিউসারের সাথে দেখা করতে হবে। বেলা একটায় সময় দিয়েছে। আমাকে দেখা করতেই হবে।

তাহলে এই এলাকাটা তুমি দেখার সময় পাবে না?

না। আমি দুঃখিত গ্লেন।

গ্লেন লিভিংস্টোনের একটু আশাভঙ্গ হল। সে ভেবেছিল তারিককে এই এলাকাটি দেখিয়ে মুগ্ধ করে দেবে। নিউ ইয়র্ক শহরে গিয়ে ফিরে আসতে আসতে চোখ বুজে সারাটি দিন চলে যাবে।

তারিক বলল, নূতন জায়গা, আগে কখনো যাই নি। তা ছাড়া ম্যানহাটানের যে গল্প শুনি, আমি একটু সময় নিয়ে যেতে চাই। একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে। তুমি আমাকে কাছাকাছি একটা কার রেন্টাল অফিসে নামিয়ে দাও।

গ্লেন বলল, তা দিচ্ছি। আজ অবশ্যি ছুটির দিন, রাস্তাঘাটের অবস্থা এত খারাপ হবে না। ছুটির দিনে তোমার সেই প্রডিউসার থাকবে তো?

বলেছে থাকবে।

গ্লেন একটু ভেবে বলল, এক কাজ করা যাক।

কি?

আমি তোমাকে ম্যানহাটান নিয়ে যাই। আমি রাস্তাঘাট চিনি, অনেকবার গিয়েছি। তোমাকে চট করে নিয়ে যেতে পারব।

তুমি কেন কষ্ট করে—

কষ্ট কী বলছ! আমার নিজের স্বার্থ। আমি চাই তুমি আমাদের কোম্পানিতে জয়েন কর। সেজন্যে আমি তোমাকে এখানকার সব ভালো ভালো জায়গা, ভালো ভালো জিনিস দেখিয়ে দিতে চাই। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি?

ম্যানহাটানে তুমি নিজে যদি গাড়ি চালিয়ে যাও, তোমার এমন একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হবে যে এই জন্মে তুমি আর এই এলাকায় ফিরে আসবে না।

তারিক শব্দ করে হাসল। গ্লেন মানুষটি বেশ।

গ্লেন তারিককে নিয়ে বেশ খানিকটা ঘুরে ম্যানহাটানে এল। তাদের কোম্পানিতে জয়েন করলে সে কোন এলাকায় থাকবে, কোন এলাকায় বাজারপাতি করবে, আনন্দ বিনোদনের জন্যে কোথায় বেড়াবে, এর মাঝেই তাকে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে দিল। যেসব এলাকায় তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, সেগুলি সবই একেবারে ছবির মতো সুন্দর। দেখে লোভ লেগে যায়। তারিকের বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটি অস্থায়ী। সেখানে কয়েক বছর হয়ে গেল। এখন স্থায়ী একটা চাকরি নেবার সময়। কোম্পানির এই চাকরিটি তার জন্যে চমৎকার হয়। একেবারে গোড়া থেকে নূতন একটা গ্রুপ করে তুলবে নিজের ইচ্ছেমতো। অনেক টাকা বেতন দেবে, হ্রদের তীরে ছোট একটা বাড়ি কিনতে পারবে সে। ছুটির দিনে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসবে একটা বই নিয়ে।

তারা যখন ম্যানহাটান পৌঁছেছে, তখনো দুপুরের খাবারটা সেরে নেবার মতো খানিকটা সময় রয়ে গেছে। গ্লেন তারিককে খুব ভালো একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল লাঞ্চের জন্যে।

এ. বি. সি. টেলিভিশনের বিল্ডিংটি খুঁজে বের করে লিফট দিয়ে উঠে এল দু' জন। ছুটির দিন, কিন্তু লোকজন বেশ আছে। বাইরের দিকে স্বর্ণকেশী সুন্দরী একজন রিসেপশনিষ্ট বসে আছে। টেলিফোনটা কানে চেপে ধরে রেখেই তারিক আর গ্লেনের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলল, তোমাদের সাহায্য করতে পারি?

হ্যাঁ। আমি ডেভিড বোম্যানের সাথে দেখা করতে এসেছি।

ডেভিড? ডেভিড হচ্ছে এগার নম্বর রুমে। সোজা গিয়ে ডান দিকে। খুব ব্যস্ত। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছ?

হ্যাঁ। একটার সময় দেখা করার কথা।

তারিক আর গ্লেন হেঁটে হেঁটে ভিতরে আসে। লোকজন মাথা নিচু করে কাজ করে যাচ্ছে, যেদিকেই চোখ যায় বড় বড় কম্পিউটার মনিটর। ডেভিড বোম্যানের ঘর খুঁজে দেখা গেল ভিতরে কেউ নেই। তারিক বাইরে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতেই মধ্যবয়স্ক একজন মানুষকে দেখিয়ে দিল। একটা বড় কম্পিউটার মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে আরেকজনের সাথে কথা বলছে।

তারিক এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি কি ডেভিড বোম্যাল?

লোকটি ঘুরে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ।

আমি তারিক। তোমার সাথে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম একটার সময়।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে, টেলিভিশনের ব্যাপার, বুঝতেই পার। তোমার সাথে অল্প বিকেলে কি কথা বলতে পারি? এই মনে কর চারটের দিকে? তখন সময় দিতে পারব।

আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। আবার ফিরে যেতে হবে। আমার বেশি সময় লাগবে না। একটা প্রশ্ন করব শুধু। উত্তর দিতে তোমার এক মিনিটও লাগবে না।

বেশ। কী প্রশ্ন?

তারিক এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। চারিদিকে এত মানুষজন, পিছনে প্লেন দাঁড়িয়ে, তার মাঝে সবাইকে শুনিয়ে সে প্রশ্নটা করবে? সংকোচ ঝেড়ে ফেলল সে, বলল, গতকাল সন্ধেবেলা তোমরা সারা বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি দেখিয়েছ মিনিট দুয়েকের একটা প্রোগ্রামের মাঝে—

হ্যাঁ, ভিডিও মন্তাজ।

তুমি তার দায়িত্বে ছিলে?

হ্যাঁ।

কোন ঘটনাগুলি দেখানো হবে সেটা তুমি ঠিক করেছ?

হ্যাঁ।

বিপর্যয়ের অংশে এসে তুমি কুর্দি মানুষদের দুঃখের ছবি দেখিয়েছ, তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের দেখিয়েছ, সাউথ আফ্রিকার খুনোখুনি দেখিয়েছ, লেবাননে বোমা বিস্ফোরণে মানুষের মৃত্যু দেখিয়েছ, কুয়েতের হত্যাকাণ্ড দেখিয়েছ, কিন্তু বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাস দেখাও নি। সেই ঘূর্ণিঝড়ে তিন লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল—

ডেভিড বোম্যাল বলল, মিষ্টার তারিক, তোমার সাথে কি আমি অফিসের ভিতর কথা বলতে পারি?

তারিক মাথা নাড়ল, না, আমি এখানে শুরু করেছি, এখানেই শেষ করতে চাই। আমার প্রশ্নটি খুব সহজ। ঠিক কী কারণে তুমি মনে কর ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের তিন লক্ষ মানুষের মরে যাওয়াটি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়?

ডেভিড বোম্যাল একটু হকচকিয়ে গেল, কী—একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল হঠাৎ, একটু অবাক হয়ে তারিকের দিকে তাকাল, যেন প্রথম বার তাকে দেখছে। তারিক মুখ শক্ত করে বলল, আমার প্রশ্নটি খুব সহজ মিষ্টার বোম্যাল। ভূমিকম্পে তুরস্কের কয়েক শ' মানুষ মারা যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সাদ্দাম হোসেনের বোমায় হাজারখানেক কুর্দির মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কুয়েতে শ' খানেক মানুষের মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে তিন শ' হাজার মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ নয় কেন? কেন?

তারিকের গলার স্বর উঁচু হয়ে গিয়েছে, নিজেকে সে আর ভদ্রতার খোলস দিয়ে আটকে রাখতে পারছে না। ইচ্ছে করছে এই মানুষটার টুঁটি চেপে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে। কাঁপতে কাঁপতে সে প্রায় চিৎকার করে বলল, বল, কেন বাংলাদেশের তিন শ' হাজার মানুষের মৃত্যু একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়?

ডেভিড বোম্যাল স্থির দৃষ্টিতে তারিকের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, তুমি তো জান, কেন সেটা উল্লেখযোগ্য নয়।

না, আমি জানি না। তুমি বল—

পৃথিবীর হিসাবে বাংলাদেশের মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না মিষ্টার তারেক। তাই বাংলাদেশের তিন শ' হাজার মানুষ মরে গেল কি বেঁচে গেল সেটা নিয়ে পৃথিবীর কারো কোনো কৌতূহল নেই—

তারিক ভয়ংকর দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ডেভিড বোম্যালের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, আমার সাথে সত্যি কথা বলার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

তারিক ঘুরে দাঁড়াল, প্লেন পিছনে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু এগিয়ে এসে তারিকের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এটা তো হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না! আর কারো সাথে কথা বলা দরকার—

তারিক বাধা দিয়ে বলল, চল আমরা যাই।

কিন্তু—

তারিক অনুনয় করে বলল, প্লীজ।

প্লেন খানিকক্ষণ তারিকের চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বলল, আমি আমার দেশের পক্ষ থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাই তারিক। তোমার দেশের কাছে ক্ষমা চাই।

তারিক উত্তর না দিয়ে হাঁটতে থাকে। এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

নীল হ্রদের পাশে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলছে। হ্রদের তীরে তীরে উজ্জ্বল রংয়ের বাসা, দূর থেকে মনে হয় পুতুলের ঘরবাড়ি। তারিক অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, প্লেন।

কি?

আমি মনে হয় তোমাদের কোম্পানিতে জয়েন করতে পারব না।

কেন?

আমি ফিরে যেতে চাই।

কোথায়?

দেশে।বাংলাদেশে।

গ্রেন দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, তুমি যেটা করতে চাও সেটাই তুমি কর। তবে আমার শুধু একটা অনুরোধ, তুমি এখন কোনো সিদ্ধান্ত নিও না। লস এঞ্জেলসে ফিরে যাও। সপ্তাহখানেক সময় যেতে দাও—তারপর।

বেশ।

আরো খানিকক্ষণ পরে গ্রেন জিজ্ঞেস করল, তোমার দেশে কি তোমার কোনো চাকরি আছে?

না, নেই। তারিক হঠাৎ হেসে উঠে বলল, ভুল বললাম। একটা চাকরি আছে।

কী চাকরি?

নীল গাঙ নামে একটা নদী আছে, তার তীরে একটা গ্রাম— সেই গ্রামের নাম নীলাঞ্জনা। সেই গ্রামে গোলাম মুস্তফা সরকার নামে একজন শিক্ষক আছেন। তাঁর একটা স্কুল আছে, সেই স্কুলের নাম গণমুক্তি। গোলাম মুস্তফা সরকার সেই স্কুলে আমাকে একটা চাকরি দিয়ে গেছেন। তাঁর স্কুলে বিজ্ঞান পড়ানো। থাকা খাওয়া ফ্রী। বেতন কত শুনবে?

কত?

থাক, শুনে কাজ নেই। তুমি হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে যাবে।

গ্রেন চোখের কোণা দিয়ে তারিককে দেখে বলল, তুমি—তুমি ঠাট্টা করে বলছ, তাই না?

ঠাট্টা? তারিক শব্দ করে হেসে বলল, হ্যাঁ, মনে হয় ঠাট্টাই করছি।

গ্রেন আস্তে আস্তে বলল, তুমি এখন কোনো সিদ্ধান্ত নিও না। প্লীজ! মানুষের জীবন কিন্তু একটাই। সেটা একবার ভুল হয়ে গেলে কিন্তু আবার গোড়া থেকে শুরু করা যায় না।

হ্যাঁ, জানি।

দু' জন চুপ করে বসে রইল। গাড়ি হ্রদের পাশ দিয়ে ছুটে যেতে থাকে।

১৪

তারিক জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে আকাশ সাদা ও ধোঁয়াটে। নিঃশব্দে তুষার পড়ছে। ধীরে ধীরে ঢেকে যাচ্ছে চারদিক। ঘরবাড়ি গাছপালা বন প্রান্তর আর আলাদা করে চেনা যায় না। বরফের সাদা চাদরের নিচে সব এক হয়ে মিশে গেছে। তারিক একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

এই দিকে বহু দূরে সে তার দেশকে ফেলে এসেছে।